বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ভূপাল মামলা : আত্মসমর্পণ

জল বাঁচাও জীবন বাঁচাও

সভ্য অন্ধ বিশ্বাস

পর্যালোচনা : খাদ্যে ভেজাল

এইড্‌স মহামারী হবে কি

মনের সমস্যা

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কাশিত——দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা □ মার্চ-জুন 1989——দাম দু'টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মার্চ-জুন 1989 দ্বাদশ বর্ষ □ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

1 ভুপাল : সমঝোতা না আত্মসমর্পণ
□ অনিল সদগোপাল ও সুজিত দাশ

4 "জল বাঁচাও জীবন বাঁচাও
□ শান্তনু ত্রিবেদী ও মৌসুমী ভৌমিক

7 সভ্য অন্ধ বিশ্বাস : জাতীয় ঐক্য ও অশোকস্তম্ভ
□ সৌমেন গুহ

12 খাদ্যে ভেজাল : একটি পর্যালোচনা
□ সুস্মিতা ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

15 এদেশে এইড্‌স মহামারী হবে কি
□ পাচু রায়

18 মনের সমস্যা : আমরা কি কিছুই করতে পারি না
□ সুখময় ভট্টাচার্য

20 জনবিজ্ঞান কংগ্রেস 1989
□ বিশেষ প্রতিবেদক

21 একটি আকর্ষণীয় আলোচনাচক্র : বিষয় 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার'
□ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

22 ভারতে গবেষণাগারের ব্যাধি
□ নিখিলেশ, দেবাশিস

23 বই পরিচিতি : ঘূর্ণীঝড়ের রাজনীতি
□ লতিকা গুহ

তৃতীয় প্রচ্ছদ
উৎস মানুষের 'আজ্ঞা' □ নিলয় রায়
'গণদর্পণ' সমাচার □ প্রতিবেদক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নিচে ঠিকানা দেওয়া হল।

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী □ B2 বৈশাখী □ 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074

প্রকাশিত হ'ল

□ বিজ্ঞান শিক্ষা : প্রাথমিক হালচাল

□ না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না

প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
B2 বৈশাখী, 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' কোথায় পাবেন :

□ বুকমার্ক—কলেজ স্কোয়ারের পিছনে (মনীষার পাশে)
□ কথাশিল্প—কলেজ স্ট্রীট
□ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
□ 'রাণার দোকান'—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে।
□ মহীন্দর, মহেন্দ্র মণ্ডল, শম্ভু মণ্ডল—কলেজ স্ট্রীট (পাতিরামের সামনে ফুটপাথের স্টলগুলো)
□ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (CESC-এর বিপরীত ফুটপাথে)
□ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের দোকানের)
□ 'উৎস মানুষ'-এর অফিস—2 রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9 (এন-বি-সি'র উল্টোদিকে)
□ দমদম স্টেশন—(1নং ও 2নং প্লাটফর্মের স্টলগুলো)
□ শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুকস্টল, ও ব্যারাকপুর স্টেশনের স্টল

এ ছাড়াও খোঁজ করুন :

□ রবীন চক্রবর্তী—অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ।
□ বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত—বালিগঞ্জ পোস্ট অফিস (বিড়লা মন্দিরের বিপরীতে)।

ভূপাল : সমঝোতা না আত্মসমর্পণ

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয় মামলার রায় বেরিয়েছে 14 ও 15ই ফ্রেব্রুয়ারী। গত সংখ্যা বি ও বি'তে এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশিত হয়। বর্তমান লেখাটি একটু ভিন্ন ধরনের: রায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা। মূল লেখাটি বড় ছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন কার্বাইড এখন দুনিয়া জুড়ে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, নিশ্চিন্তে মানুষ মারার কার্যক্রম চালু রাখতে পারে। কারণ গত 14ই ফেব্রুয়ারী '89 তারিখে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টে 'ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়'-এর মামলার রায়ে কার্বাইড এই অধিকার অর্জন করেছে। ওই রায়ে তাকে গ্যাস বিপর্যয়ের সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গ্যাস পীড়িতদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ সাহায্য বাবদ ইউনিয়ন কার্বাইডকে দিতে হবে 47 কোটি ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় 715 কোটি টাকা মাত্র।

এদিকে খবরে প্রকাশ, রায় বেরুনোর প্রায় সাথে সাথেই মার্কিন বাজারে কার্বাইডের শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে—ইউনিট পিছু দু'ডলার। কোম্পানী জানিয়েছে এই সমঝোতার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের 1988 সালের মুনাফা থেকে দণ্ড যাবে শেয়ার প্রতি মাত্র 50 সেন্ট।

অর্থাৎ এক কথায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্প দুর্ঘটনার দায় থেকে ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন বেকসুর খালাস পেয়ে গেল—ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের এক কলমের খোঁচায়।

করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, এ মামলা নিছক কয়েক কোটি ডলার আদায়ের মামলা নয়। এর সাথে যুক্ত রয়েছে আরও বড় প্রশ্ন: আজকের দুনিয়ায় সর্বশক্তিমান বলে খ্যাত বহুজাতিক কোম্পানীও যে আইনের ঊর্ধে নয়—সে কথা প্রমাণের প্রশ্ন। সারা বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দৃষ্টান্ত দেখতে চাইছে।

বিচারপতি শ্রী পাঠক যেই সমঝোতার প্রস্তাব রাখলেন—দু'পক্ষই তাতে হামলে পড়ল। এমন কি ভারত সরকারের এটর্নী জেনারেল শ্রী কে. পরাশরনও। যিনি 14ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত লড়ে আসছিলেন একথা প্রমাণের জন্য যে 1984'র ডিসেম্বর 2/3 রাত্রে কার্বাইডের কারখানায় ঘটে যাওয়া গ্যাস বিপর্যয়ের গোটা দায়িত্ব মূল কোম্পানী ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের। এখনে এই রায়ে নথীভূক্ত হয়ে রইল, কার্বাইডের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা তুলে নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই সংক্রান্ত মামলা না রুজু করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা হোল। এবং এর দায়িত্ব যে কার্বাইডের নয় প্রমাণ রাখার জন্য লেখা হল কার্বাইডের দেয় টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদে নয়—ক্ষতিগ্রস্তদের মঙ্গলার্থে অনুদান। শ্রী পরাশরণ

"1986 সালে ভূপাল কোর্টে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভারত সরকারের দাবী ছিল 330 কোটি ডলার। কার্বাইড রাজী ছিল 35 কোটি ডলারের রফায়। ভারত সরকার তখন রাজী হননি। এরপর তিন বছর অতিক্রান্ত। এখন রাজী হলেন— 47 কোটি ডলারে। তিন বছরে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের হিসেব কষলে দেখা যাবে কার্বাইড কিন্তু তার 35 কোটি ডলারের হিসেব থেকে বিশেষ নড়েনি। —নড়েছে ভারত সরকার।"

সমঝোতা না আত্মসমর্পণ

বিচারের দায়িত্বে ছিলেন পাঁচ সদস্যের সুপ্রীম কোর্ট বেঞ্চ। নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রী রঘুনন্দন পাঠক। রায়ের পক্ষে যে অজুহাতই দেখানো হোক না কেন দুনিয়া জুড়ে এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু ভাল হয় নি। প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলেছেন, এ রায় বহুজাতিক কোম্পানীর চাপের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছু নয়।

শর্ত তথা আইনগত দায়িত্ব প্রসঙ্গে

1987 সালে ভারত সরকার একবার সমঝোতায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। সে সময় প্রখ্যাত আইনবিদ শ্রী বি. আর. কৃষ্ণ আয়ার, অধ্যাপক উপেন্দ্র বক্সী প্রমুখ কয়েকজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

আনন্দের সাথে মেনে নিলেন সমস্ত শর্ত। যে মামলা নিয়ে এত দিন ধরে এত বাক্য ব্যয় হল—দুপক্ষ মিলে তার সমঝোতার বয়ান তৈরীতে সময় লাগল মাত্র একদিন! বিচারপতি সময় দিয়েছিলেন—একদিন-ই !!

অন্য নজীর—ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির

কারেন সিঙ্কউড মামলার নজীর উল্লেখ করা যায়। পরমাণু জ্বালানী উৎপাদনকারী সংস্থার উদাসীনতার শিকার হয়েছিলেন ওই সংস্থার কর্মী কারেন সিঙ্কউড। অপরাধ প্রমাণের পর আদালতের রায়ে ক্ষতিপূরণ ধার্য হয়েছিল 5 লক্ষ ডলার এবং শাস্তিমূলক জরিমানা ধার্য হয়েছিল এক কোটি পাঁচ লক্ষ ডলার। রায়ে উল্লেখ ছিল, কোম্পানীর অপরাধ শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়ায় ঔদাসীন্যই নয়—তথ্য গোপনের

প্রয়াসও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কার্বাইডের ক্ষেত্রে যে অপরাধ কয়েক হাজার গুণ বেশী। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ত্রুটির ফলে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। তারপরও মিক বিষক্রিয়ায় মানুষের শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কার্বাইড কর্তৃপক্ষ কোন সহযোগিতা করেনি। বরং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। তবু তারা সমস্ত দায় থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

সুপ্রীম কোর্ট এ সমস্ত তথ্য না জেনে রায় দিয়েছে এমন নয়। কারণ এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পেশ করা হয়েছিল আরেকটি মামলা প্রসঙ্গে। সুপ্রীম কোর্ট (মাইনরিটি) কমিটি তাদের রিপোর্টে এই তথ্য দিয়েছে। [ডাঃ নিশীথ ভোরা এবং অন্য কয়েকজনের দায়ের করা মামলার ফলশ্রুতিতে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতানৈক্য হওয়ার ফলে ওই কমিটির দুই সদস্য ডঃ অনিল সদগোপাল এবং ডাঃ সুজিত কুমার দাস তাদের পর্যবেক্ষণ আলাদাভাবে পেশ করেন। সেটিই বর্তমানে মাইনরিটি রিপোর্ট হিসেবে পরিচিত—সঃমঃ] তার ভিত্তিতেই এই সুপ্রীম কোর্টই ইউনিয়ন কার্বাইডকে মিক এবং আনুষঙ্গিক গ্যাসের বিষক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল।—তার পরও এই রায়!

মামলা খারিজ প্রসঙ্গে

আলোচ্য রায়ে বলা হয়েছে—'এই দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভূত ও সেই সংক্রান্ত সমস্ত মামলা—যতদিন ধরেই চলে থাকুক, সব খারিজ করে দেওয়া হল।'—এ অধিকার সুপ্রীম কোর্টের আছে কিনা খতিয়ে দেখার বিষয়। আসলে ইউনিয়ন কার্বাইড এবং ভারত সরকারের মধ্যে যে আপোষের চেষ্টা চলছিল তার আইনী মোড়ক দেওয়া হল এই রায়ের মাধ্যমে।

কার্বাইডের ভাবী উকিল ভারত সরকার

হ্যাঁ,—সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এই গ্যাস বিপর্যয় সংক্রান্ত মামলা মোকাবেলার দায়িত্ব মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের। প্রকৃতপক্ষে এই রায়ের মাধ্যমে গ্যাস পীড়িতদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে মামলা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আগামী দিনে এই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় কোন দুরারোগ্য ব্যাধি, কোন জন্মগত ব্যাধি অথবা প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের মত ক্ষতির কারণেও কিছু করার থাকল না। যদিও এই ধরনের ক্ষতির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট—মাইনরিটি কমিটির রিপোর্টে তা দেখানো হয়েছে। এমন শর্ত ভারতীয় নাগরিকদের সংবিধান-প্রদত্ত আত্মরক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করছে না কি?

ক্ষতিপূরণের ভিত্তি—আদৌ আছে কি?

গ্যাস পীড়িতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ধার্য হয়েছে 47 কোটি ডলার। অর্থাৎ 715 কোটি টাকা। কিভাবে সুপ্রীম কোর্ট এই অঙ্ক ধার্য করলেন? আমাদের সন্দেহ এর তথ্য-ভিত্তি নিয়ে। মৃত্যু, ব্যাধি, পঙ্গুত্বের মত ক্ষতি ছাড়াও আছে লাখ খানেক লোকের কর্মক্ষমতা হ্রাস এবং দীর্ঘকালীন ব্যাধির চিকিৎসার প্রশ্ন। যে চিকিৎসা হয়ত নিছক হাসপাতাল-বাড়ী আর ক'জন ডাক্তার কর্মী দিয়েই সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন রীতিমত পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চিকিৎসা ছাড়া আছে পুনর্বাসনের প্রশ্ন; আছে অবশিষ্ট কর্মক্ষমতা অনুযায়ী জীবিকার প্রকল্প।—মানুষ ছাড়াও আছে গবাদি পশু নাশের ক্ষতিপূরণ। আছে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন। সহজেই অনুমেয়, 715 কোটি টাকা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের আন্তরিক উদ্যোগ ভারত সরকার কখনই নেয়নি। যদিও 1987 সালে ভুপাল জেলা আদালতের শ্রী এস. ডব্লু. দেব এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভারত সরকার অত্যন্ত দায়সারা ভাবে এই কাজ করেছেন। এখন দেখেশুনে সন্দেহ হয়, তাদের এই ঢিলেঢালা-ভাব খুবই সুপরিকল্পিত—কার্বাইডের স্বার্থেই। অযথা কালক্ষেপ করে, বিতর্কের নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, প্রমাণাদি সূত্র লুপ্ত হতে দিয়ে, অযথা গোপনীয়তার বেড়াজাল গড়ে—তথ্য সংগ্রহের কাজটাকেই ভণ্ডুল করা হয়েছে। এই দায়িত্ব রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের।

এর সপক্ষে নজিরের অভাব নেই। দুর্ঘটনার পরে পরেই হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ, পঙ্গু হয়ে পড়ছেন চোখে দেখেও সরকার কার্বাইডের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করে বসেছিলেন। কার্বাইড কর্তৃপক্ষ বোঝাচ্ছিল—'ও কিছু নয়। সামান্য একটু চোখ জ্বালা, ফোলা হয়েই সব মিটে যাবে'।

রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে মিক-এর রাসায়নিক ক্রিয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও এবং গ্যাস আক্রান্ত ব্যাপক অংশ মানুষের পেচ্ছাপে আইসো-সায়ানাইডের উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরেও এ নিয়ে কোন বিশদ এপিডেমিওলজিকাল সার্ভের বন্দোবস্ত করা হয়নি। অথচ কেবলমাত্র রক্ত এবং প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ করেই বিষ-ক্রিয়ার ব্যাপ্তি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যেত—যা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তি গড়ে উঠতে পারত। গড়ে উঠতে পারত আগামী দিনের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনার ছক তথা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ের বাস্তব ভিত্তি।

—তা হয়নি। নিছক মর্জিমাফিক কিছু বস্তি এলাকাকে গ্যাস আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। হয়ত তেমনভাবেই নির্ণীত হয়েছে ক্ষতিপূরণের অঙ্কও।

ক্ষতিপূরণের মূল দাবী কোথায় গেল

1986 সালে ভূপাল কোর্টে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভারত সরকারের দাবী ছিল 330 কোটি ডলার।—কার্বাইড রাজী ছিল 35 কোটি ডলারের রফায়। ভারত সরকার তখন রাজী হননি। এরপর তিন বছর অতি-ক্রান্ত। এখন রাজী হলেন—47 কোটি ডলারে। তিন বছরে চক্রবৃদ্ধি

হারে সুদের হিসেব কষলে দেখা যাবে কার্বাইড কিন্তু তার 35 কোটি ডলারের হিসেব থেকে বিশেষ নড়েনি।—নড়েছে ভারত সরকার।

যাদের মামলা তারাই নেই মঞ্চে

গ্যাস পীড়িতদের পক্ষে এই মামলার ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ভারত সরকার। তার পর কোন পর্বেই সেই গ্যাস পীড়িতদের কোন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ রাখেনি তারা। এইভাবে চলল বিচার-পর্ব। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এমন নজীর মিলবে না হয়ত। তবে শেষ পর্বে—হয়তো দোষ স্খালনের নিমিত্তই—সুপ্রীম কোর্টের রায়ের এক ফাঁকে 'জাহরেলী গ্যাস কাণ্ড মোর্চা'র নামোল্লেখ রয়েছে। যদিও তাদের সাথে কখনও আলোচনা করেছেন এমন খবর নেই।

গণসমালোচনা এবং বিচারকের প্রতিক্রিয়া

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে দেশ জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তাতে বিচলিত বোধ করছিলেন এক বিচারপতি—শ্রী ই. এস. ভেঙ্কটরামাইয়া। রায়দানকারী বেঞ্চের পাঁচ সদস্যের একজন তিনি। তিনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন—14 ও 15 ই ফেব্রুয়ারী দেওয়া ভূপাল রায়ের থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চান তিনি। এবং এও জানিয়েছিলেন—এখন উচিত হবে সেই রায় তুলে নিয়ে মামলাটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। এই প্রতিক্রিয়ায় হতচকিত প্রধান বিচারপতি শ্রী পাঠক জানান—প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা একটি যথাযথ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তবে 'যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তো আমরা সানন্দে শোধরাতে প্রস্তুত'।

মীমাংসা সূত্র প্রত্যাহার হলে

জব্বলপুর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কার্বাইডের আবেদনক্রমে এই মামলা সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে আসে। জব্বলপুর হাইকোর্টের রায়ে দিল্লীর শ্রীরাম কারখানার ওলিয়াম দুর্ঘটনা মামলার রায়ের উল্লেখ ছিল। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী পি. এন. ভগবতীর দেওয়া সেই বিখ্যাত রায়ে বলা হয়েছিল যে, কোন কারখানার দ্বারা জনজীবনের কোন ক্ষতি হলে তার পূর্ণ দায়িত্ব সেই কারখানা কর্তৃপক্ষের—তা সেই দুর্ঘটনা যে কারণেই ঘটুক না কেন। এক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য ছিল এই রায় কার্বাইডের ভূপাল কারখানার দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা খতিয়ে দেখা। সেই বিচারে না গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট মীমাংসার ফতোয়া দিলেন। তাই যদি এই রায় প্রত্যাহৃত হয় তো ভূপাল দুর্ঘটনার দায়িত্ব কার তা নির্ধারণের সুযোগ পুনরায় ফিরে পাওয়া যাবে। আর সেই সাথে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে দেশে ব্যবসার নামে যে অপকর্ম ও অপরাধ করে থাকে তার দায়িত্ব মূল কোম্পানীর কিনা এই বিতর্কের অবসান হতে পারে।

ভারতীয় বিচার ও মার্কিনী আদালত

একটি আশঙ্কার কথা অনেকে ছড়াচ্ছেন। মামলার রায় কার্বাইডের মনঃপুত না হলে তারা আবার মার্কিন আদালতের শরণাপন্ন হবে। এই আশঙ্কা অমূলক। তা করতে হলে কার্বাইডকে প্রমাণ করতে হবে ভারতীয় আদালতে তারা সুবিচার পায়নি, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্যের উপর নির্ভর করে রায় দেওয়া হয়েছে।

কাজটি সহজ নয়। জব্বলপুর হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী শেঠ মার্কিনী আইন ও নিয়মকানুন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এই রায় মার্কিনী আদালতেও গ্রাহ্য হওয়ার কারণ নেই।

মানবিকতা না করুণা

সমঝোতার পক্ষে যুক্তি হল গ্যাস পীড়িতদের মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুত ত্রাণ পৌছে দেওয়া। মামলা ফয়সালা হতে দেরী হবে। দেরী হবে ত্রাণকার্য। তাই অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয়ের কাজটা উপেক্ষা করা হল।

কিন্তু যাদের জন্য এই ভাবনা তারা কিভাবে দেখেছে ব্যাপারটা? 22 শে ফেব্রুয়ারী হাজার দুয়েক গ্যাস পীড়িত মহিলা দিল্লীর রাজপথে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ জানিয়ে এসেছে এই রায়ের বিপক্ষে। এই দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে 9ই মার্চ বিক্ষোভ দেখিয়ে হাজার খানেক লোক গ্রেপ্তার বরণ করেছেন ভূপালে। তাঁরা এই রায়কে 'প্রতারণা' বলে ঘোষণা করেছেন।

আমাদের প্রশ্ন, সুপ্রীম কোর্ট গ্যাস পীড়িতদের প্রতি এতই সহানুভূতিশীল তো আগে যখন এমন সুযোগ এসেছিল তখন কেন চুপ করে ছিলেন? কেন গত অক্টোবরে 'গ্যাস পীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন'-এর তরফে যখন আবেদন জানান হয়েছিল তখন অনুরূপ রায় দেন নি? সে আবেদনে দাবী ছিল যতদিন না কার্বাইডের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় হচ্ছে ততদিন সংবিধানের 21 ধারা মতে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার পিছু 500 টাকা করে অনুদান দেওয়া হোক। অথবা তারও আগে নিশীথ ভোরা ও অন্য দুজন গ্যাস পীড়িতের দায়ের করা আবেদনে সুপ্রীম কোর্ট এইভাবে সাড়া দিলেন না কেন? কেন সুপ্রীম কোর্ট (মাইনরিটি) কমিটির সুপারিশ মত গ্যাস পীড়িতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সংগঠনের জন্য একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সংস্থা গঠন করলেন না?—সময়মত এসব না করে এখন হঠাৎ সহানুভূতি দেখানোর ব্যাপারটা কেমন ঠেকছে।

গ্যাস পীড়িতদের দাবী

আইনী পথে অপরাধী ও অপরাধের মাত্রা নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকুক, তাঁরা চাইছেন। তৎসহ অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ ও মেডিকেল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে মাইনরিটি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তাঁরা চাইছেন। একমাত্র এই পথেই গ্যাস পীড়িতদের প্রতি সুবিচার এবং বিশ্ববাসীর কাছে, বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের কাছে, আমাদের বিচার ব্যবস্থার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।

ডঃ অনিল সদগোপাল ও ডাঃ সুজিত কুমার দাশ

[মূল রচনা হিন্দী থেকে অনুবাদ করেছে সুভাষ গাঙ্গুলী এবং সংক্ষিপ্ত করেছে রবীন চক্রবর্তী]

জল ও জলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষের সমস্যার কথা। সঙ্গে থাকছে 'ন্যাশনাল ফিশারমেন্‌স ফোরাম'-এর সভাপতি টমাস কোচারির সাক্ষাৎকার।

"জল বাঁচাও জীবন বাঁচাও"

শান্তনু ত্রিবেদী ও মৌসুমী ভৌমিক

ন্যাশনাল ফিসারমেন্‌স্ ফোরাম-এর ডাকে গত 2রা এপ্রিল থেকে 1লা মে, 1989-এ "জল বাঁচাও, জীবন বাঁচাও" এই দাবীতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, ও কেরলের সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানী, শিল্পী, শ্রমিকনেতা, সমাজসেবী, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমজীবী বিশেষ করে মৎস্যজীবী মানুষ একই লক্ষ্যে মিলিত হয়ে মিছিল জনসভা, আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ কন্যাকুমারী অভিমুখে পদযাত্রা করেন, এবং 2রা মে কন্যাকুমারীতে এক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষ্যে গত 2রা এপ্রিল থেকে 4ঠা এপ্রিল বাসন্তী, কুলতলী, রায়দীঘি, জুনপুট ও কলকাতায় বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি মানুষের সহযোগিতায় মিছিল, জনসভা, আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 7ই এপ্রিল কলকাতায় এন্টালি একাডেমি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেন সাপোর্টিভ অ্যাকসন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান প্রতিবেদনটি ঐ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা।

জল

জল জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। জীবনের শুরুও ঐ জলেই। সমস্ত বিপাকীয় কাজে জলই প্রধান ভরসা বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন চক্র জল ছাড়া অচল। শক্তিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে জল। জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রেও জল প্রধান নিয়ন্ত্রক। মাটির ক্ষয়, পলি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও জীবজগতে কার্বন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের আসা যাওয়া সবই সম্ভব এই জল আছে বলে। মানুষের একটা বৃহত্তর অংশের কাছে জলই জীবিকার উৎস। তাই জলের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, জল-দূষণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র জীব-জগতের গভীর বিপদ ডেকে আনে।

ভারতে কত জল, পশ্চিমবঙ্গের মোট জলভাগ

এখানে বৃষ্টি ও বরফ গলা জলের পরিমাণ বছরে 400 মিলিয়ন হেক্টর মিটার। এছাড়া হিমালয় সংলগ্ন নদীগুলো বয়ে আনে আর 20 মিলিয়ন হেক্টর মিটার জল (মিলিয়ন হেক্টর মিটার = m ham)। এই 420 m ham জলের মধ্যে 70 m ham ভূপৃষ্ঠে পড়ার সাথে সাথে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। বাকি 350 m ham এর মধ্যে 165 m ham মাটিতে জলীয় বাষ্প অবস্থায় মিশে থাকে। 135 m ham নদী-নালা-পুকুর-খাল বিল দ্বারা বাহিত হয়। অবশিষ্ট 50 m ham ভূগর্ভে জলের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

উপরোক্ত 350 m ham জলের মধ্যে মোট 200 m ham জল আস্তে আস্তে বাষ্পীভূত হয়,—ভূপৃষ্ঠের উত্তাপে এবং উদ্ভিদের বাষ্প মোচন প্রক্রিয়ায়। বাকি 150 m ham জলের বেশীর ভাগই সমুদ্রে মেশে, কিছুটা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও চলে যায়। যে জলটুকু মাটি চুঁইয়ে ভূগর্ভে জমা হয় ঐটুকুই স্থায়ী জল সম্পদ বলা যেতে পারে, ঐ জলই ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রবাহিত জলের ভিত্তি প্রস্তুত করে।

পশ্চিমবঙ্গের জলভাগ নদী-খাল-বাঁধ-বিল-বাঁওয়র-দিঘি-পুষ্করিনী সব মিলিয়ে মোট এলাকা হবে 7 লক্ষ 70 হাজার একর। খাঁড়ি অঞ্চলে আছে 4 লক্ষ 30 হাজার একর। তাছাড়া 240 ফুট পর্যন্ত গভীর উপ-কুলীয় ক্ষেত্রের এলাকা 6 লক্ষ 42 হাজার একর। সর্বসমেত 88 লক্ষ 42 হাজার একর।

জলই যাদের জীবিকার উৎস

পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা বৃহত্তর অংশের কাছে জীবিকার্জনের জন্য জলই প্রধান উৎস। কারণ এঁরা জলজ প্রাণী শিকারী। সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ঐ জলজ প্রাণীদের ব্যবহার করে—যেমন মাছ-কাঁকড়া খাদ্য হিসাবে, মাংস ও ভিটামিন সমৃদ্ধ তেল হিসাবে হাঙর-তিমি বা ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী। এছাড়াও আছে ঝিনুক-শামুক-গুগলী সহ বিভিন্ন প্রাণী যারা কোন না কোন ভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদার অধিকাংশটুকুই পূরণ করে ঐ মাছ। পৃথিবীতে "যারা খেটে খায়" এমন মানুষের দুই থেকে তিন ভাগ ঐ মৎস্য শিকারী। যারা আমাদের কাছে মৎস্যজীবী বা জেলে বলে পরিচিত।

ঐ মৎস্যজীবীদের একটা বিপুল সংখ্যা আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। কারণ পৃথিবীর জলসম্পদ আজ সভ্যতার আগ্রাসী দূষণে বিলুপ্তির পথে। জলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ভূগর্ভস্থ জলে টান পড়া, জলধার বাঁধ নির্মাণের ফলে নদী-নালা-শাখানদী-উপনদীর গভীরতা কমে যাওয়া, তদুপরি বিপুল সংখ্যায় ভারী জাহাজ, নিউক্লিয় শক্তিচালিত সাবমেরিনের পরিত্যাজ্য জ্বালানি ও নদী-উপকুলবর্তী কলকারখানা ও শহরের যাবতীয় ক্ষতিকর বর্জ্যদ্রব্য, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, কীটনাশক ইত্যাদি জলে মেশার ঘটনা পৃথিবীর জল বণ্টনের অসমতার জন্য, জলের মাত্রাতিরিক্ত দূষণের জন্য যেমন দায়ী তেমনই দায়ী মৎস্যজীবীদের জীবীকার্জনের পথকে কণ্টকিত, দুরূহ করার জন্যও। কারণ এসবের ফলে মাছের উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে, মাছ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

ভারতে মাছের আকালের পেছনে

মাছ উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সপ্তম ও নবম-এর মধ্যে ওঠানামা করে। জল দূষণের ফলে সবচেয়ে আগে এবং সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাছের উৎপাদন। 1984'র এপ্রিলে হাজার হাজার মাছ

লক্ষ্মৌ-এর কাছে গোমতির জলের দূষণের ফলে ভেসে ওঠে। একই ভাবে চম্বল ও তার শাখা-প্রশাখার দূষণেও মাছের উৎপাদনের পরিমাণ একেবারে কমে যায়। কাগজ, রাসায়নিক শিল্প, চিনি ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বর্জ্যদ্রব্যে ডেহরী-অন-শোনে মাছ বিলুপ্তপ্রায়।

কর্ণাটকের উপকূলে করোয়া শহরের কাছে বিঙ্গা জেলেদের একটা ছোট্ট গ্রাম। করোয়ার খুব কাছে বালারপোরে কস্টিক সোডা কারখানার উৎপাদনের তিনদিনের মধ্যে ঐ ফ্যাক্টরী নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের দূষণে প্রায় 500 কেজি মরা মাছ ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। 17,000 মাছের চারা উপকূলের 80 কিলোমিটার ব্যাপী জায়গা জুড়ে নষ্ট হয়। গতবছরও আগস্ট মাসে আড়াইশো কেজির মত মাছ নষ্ট হয়েছে ঐ অঞ্চলেই। অথচ ঐ কস্টিক সোডা ফ্যাক্টরী করার ছাড়পত্র দিয়েছিল কর্ণাটকের সরকারী দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। কিছুদিনের মধ্যেই ওখানকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষ একত্রে এসবের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মিছিল অনশনও হয়েছে। তবে অবস্থা যা ছিল তাই আছে। আজও সরকারের টনক নড়ানো যায়নি।

1956 সালে তৈরী দামোদর নদীর উপরের উপত্যকার বাঁধ হুগলী নদীতে জলের সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। স্রোত হয়েছে মন্দীভূত। জোয়ারের সময় সমুদ্রবেলা থেকে বিপুল পরিমাণ পলি নদীতে ঢুকে পড়ে। বাঁধ তৈরীর আগে দামোদর নদীর বন্যার তোড় প্রবল সংঘাতে প্রতি বছর হুগলী নদীর বুকের পলি ঠেলে ভাসিয়ে সাগরে নিয়ে যেত। এভাবেই হাজার হাজার বছর হুগলীর গভীরতা বজায় ছিল। দামোদরের বাঁধ সেই সহযোগের সম্পর্কটি নষ্ট করেছে। ফলে শুধু হুগলী নয় তার উপনদী দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, কাঁসাই, জলঙ্গী ও চূর্ণী নদীর খাতে বিশেষ করে মুখের দিকে পলি জমে তাদের গভীরতা ও নাব্যতা নষ্ট করেছে। এইভাবেই সুন্দরবনের জোয়ার নদী রায়মঙ্গল, কালিন্দী, গোসাবা, বিদ্যাধরী হেড়েভাঙ্গা, মাতলা ও ঠাকুরান মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। দামোদর আর 1971-এ তৈরী ফরাক্কার বাঁধ হুগলী-গঙ্গার ইলিশের জন্য প্রয়োজনীয় স্রোতের বেগ, মিঠাজলের যোগান ও নদীর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বাঙালীর প্রিয় ইলিশকে রূপালী মরিচিকায় পরিণত করেছে। কারণ ইলিশের মত পরিযায়ী মাছের ডিম পাড়া ও নিষিক্ত হওয়ার জন্য মোহনা থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে মিঠাজলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। অথচ নদী বাঁধ প্রকল্প ঐ স্থান বদলে বাধা তৈরী করেছে—ইলিশ মেরেছে, আর মেরেছে ইলিশের উপর নির্ভরশীল 60 হাজার মৎস্যজীবীরও ভাত।

ভাটার ক্ষীণস্রোতের সুযোগে হুগলীতে জোয়ারের প্রবলতা গড়ে উঠে জলে বাড়াচ্ছে লবণ ও দূষণ। বিশেষত কলকাতা বন্দর নির্গত ভাসমান তেলের স্তর, হাওড়া, কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলীর হাজার হাজার কারখানা নির্গত ক্ষতিকর জৈব, অজৈব রাসায়নিক যৌগ, পারদ, সিসের মত ভারী মৌল পদার্থ গঙ্গানদীর পরিযায়ী অপরিযায়ী সমস্ত মাছের ভাণ্ডারকে বিপর্যস্ত করেছে।

চিংড়ির চাষ ও শিকার আজ সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা টানতে। তাই বেআইনি ধান জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ব্যাপকভাবে চব্বিশ পরগণায় চিংড়ির ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে। এই নোনা ভেড়ির জন্য দরকার অজস্র বাগদার পোনা। সূক্ষ্ম মশারি-জালে বাগদার ডিমপোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে উজার হয়ে চলেছে অন্য সব মাছ ও চিংড়ির ডিমপোনা। অন্যদিকে ঢালাও বিদেশী সহযোগিতায় সুন্দরবনের দক্ষিণের অগভীর উপকূলের তলার মাটি চষে ফেলে দিনরাত চলছে বড় বড় জলযানের ট্রলারে চিংড়ি শিকার। এইভাবে আমাদের উপকূলীয় মৎস্য-ক্ষেত্রটি পরিবেশের ভারসাম্য হারাচ্ছে। অবহেলা, পরিবেশ-চেতনাহীন ভ্রান্ত-নীতি অনুসরণ ও নির্বিচারে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গের 5 কোটি 45 লক্ষ সাধারণ মানুষ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। যন্ত্রচালিত নৌকা, আধুনিক নাইলনের জালেও আর পর্যাপ্ত মাছ ধরা পড়ে না ভারতের কোথাও।

এরই মধ্যে সংযোজিত হচ্ছে নূতন বিপদ, পরমাণু বিপদ। শক্তি-সমস্যা মেটাবার নামে, দেশের প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করার নামে বিভিন্ন অঞ্চলে বসছে পরমাণু চুল্লি। এসবই জল-স্থল-বাতাসের উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট তো করবেই, আরো যুক্ত হবে তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত ছাই। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলার কুদামকুলামের পরমাণু চুল্লি দক্ষিণ কেরলকে বিপর্যস্ত করবে। নারোরার পরমাণু চুল্লিতে গঙ্গা ভীষণভাবে দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সর্বোপরি আছে সরকারী অবহেলা। মৎস্যজীবীদের বাসস্থান, সহজ ঋণ প্রকল্প, মাছের মূল্য নির্ধারণ, মাছ সংরক্ষণ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, বীমা প্রকল্প ও সার্বিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা কোন সরকারের পক্ষ থেকেই তেমনভাবে নেওয়া হয় নি। উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে জেলেদের গ্রামগুলো আজ চরম অবহেলায় বেঁচে আছে। সেখানে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা অপ্রতুল। অধিকাংশ জায়গায় হয় নলকূপ নেই কিংবা অচল। নিকাশী ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য এখনও স্বপ্ন। খরার কবলে মিষ্টি জলের আকালেই অধিকাংশ গ্রাম দূরারোগ্য-ব্যাধি-জর্জরিত। তাই আজ ভারতের সর্বত্র সংগঠিত হচ্ছে মৎস্যজীবীদের বাঁচার আন্দোলন, মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার আদায়ের আন্দোলন।

আন্দোলন : একটি সাক্ষাৎকার

ঝড়, তুফান, হাঙর আর কামটের সঙ্গে মৎস্যজীবী মানুষদের বহু যুগের সংঘাতের সম্পর্ক। তুলনামূলকভাবে যন্ত্রচালিত ট্রলার, জলীয় দূষণ, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে এ দেশের জেলেদের পরিচয় ঘটেছে এই সেদিন। সমস্যা ও সংকটের চেহারা পাল্টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রামী মানুষদের লড়াই-এর চেহারাও গেছে পাল্টে। গত ত্রিশ বছরে এ দেশের জেলেদের সংগ্রামের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়ে চলেছে।

দেশের মিঠা ও নোনা জলের ওপর যে মানুষেরা জীবিকার জন্য নির্ভরশীল, তাঁরা গত এপ্রিল মাসে এক নতুন আন্দোলনে সামিল হন। আন্দোলনের নাম, কন্যাকুমারী অভিযান; উদ্যোগে, ন্যাশনাল ফিশারমেন্‌স্ ফোরাম; উদ্দেশ্য মৎস্যজীবীদের সংকটের নানা দিক সম্পর্কে নিজেরা সচেতন হওয়া এবং অন্যদের সচেতন করা। একমাসব্যাপী এই অনুষ্ঠানের পশ্চিমবঙ্গ পর্বে যোগ দিতে ন্যাশনাল ফিশারমেন্‌স্ ফোরামের সভাপতি,

শ্রী টমাস কোচারি, কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন এপ্রিলের গোড়ায়। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে কোচারি ভারতবর্ষের মৎস্যজীবী আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন—আন্দোলনের সূচনা, ফোরামের জন্ম, পরবর্তীকালে ফোরামের ভূমিকা, কোচারির নিজের ভূমিকা ইত্যাদি সব বিষয়ে কথা হয়। কোচারির বক্তব্য ঃ

"যে জলীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে একদিন এ দেশের মৎস্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, আজ সেই সম্পদই অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে হ্রাস পাবার মুখে। তাই আমাদের আজকের আন্দোলন সম্পদ সংরক্ষণের আন্দোলন।"

প্রঃ "মৎস্যজীবীদের এই সংরক্ষণের আন্দোলন শুরু হয় কবে থেকে?"

"বলা যেতে পারে যে 1976 সালের কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন সংগঠিত হতে শুরু করে। ঘটনাগুলি ঘটে কেরল, গোয়া, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি উপকূলবর্তী রাজ্যে।

"ইঞ্জিনযুক্ত বড় নৌকো, আধুনিক জাল ইত্যাদি যান্ত্রিক উপকরণ নিয়ে যে সব জেলে মাছ ধরতে জলে নামেন, তাঁদের প্রতি ক্ষুদ্র, দরিদ্র জেলেদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ কিছু সংঘর্ষপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সে সময়। এই ঘটনায় মোট 19জন ক্ষুদ্রমৎস্যজীবী প্রাণ হারান এবং কিছু ট্রলারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

"এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে কিছু ছোট ছোট আন্দোলন-সহায়ক গ্রুপ এবং মৎস্যজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন।

1976 থেকে '78 সাল অবধি আয়োজিত বিভিন্ন সভা, আলোচনা চক্র ইত্যাদির মাধ্যমে স্থাপিত হয় আমাদের ন্যাশনাল ফিশারমেন্স্ ফোরাম। প্রথম থেকেই ফোরাম বিভিন্ন সংগঠনের সাধারণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে আসছে।"

আন্দোলনের দাবী সম্পর্কে কোচারি বলেন, "একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে আমাদের এই ফোরাম সাধারণ ভাবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিরোধিতা করছে। আমরা কেবল বলছি যে এমন কোন প্রযুক্তির ব্যবহার চলতে দেওয়া যায় না যার ফলে জলীয় সম্পদ হ্রাস পায় এবং জলীয় পরিবেশ দূষিত হয়।

"এ তো গেল বৃহত্তর দাবীর প্রসঙ্গ। এ ছাড়াও কিছু সাধারণ আইন প্রবর্তনের দাবী রয়েছে। যেমন তীরের খুব কাছাকাছি ইঞ্জিন-যুক্ত বড় নৌকো আসতে দেওয়া চলবে না, প্রজনন কালে মাছ ধরার সব ধরনের কাজ বন্ধ রাখতে হবে, পার্সজাল জাতীয় ক্ষতিকর উপকরণের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, ম্যানগ্রোভ বন কাটা চলবে না, শিল্প বর্জ্য মিঠা কিম্বা নোনা জলে ফেলা যাবে না, ইত্যাদি।"

প্রঃ "মৎস্যজীবীদের এই আন্দোলনে সরকারী তরফে কী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন?"

"প্রথম থেকেই সরকার 'আইন-শৃঙ্খলা' বজায় রাখতে সচেষ্ট। প্রয়োজনে পুলিশ, লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস, বন্দুক সব কিছুরই ব্যবহার হয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে তো আর আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না। তাই সংঘর্ষের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটেই চলে। ট্রলারে আগুন ধরিয়ে দেন ক্ষুদ্র জেলেরা; ধনী মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সম্পদ বণ্টন নিয়ে লড়াই তাঁদের নিত্য দিনের ঘটনা। অবশ্য কিছু কিছু রাজ্যে সামান্য হলেও কিছু আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রে। সেখানে প্রজননকালে মৎসজীবীদের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

"পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা বড়ই আশ্চর্যজনক। এখানকার সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের ফলে সম্পদ সংরক্ষণের যে কঠিন সংকট ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে এখানকার সরকার অদ্ভুত উদাসীন। এখানে এ বিষয়ে কোন আইন প্রবর্তনের কথা ভাবাই হয়নি।"

প্রঃ "দক্ষিণের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের এই আন্দোলনে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলি কী ভাবে? তারা জন আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করার চেষ্টা করে না?"

"করে হয়তো, কিন্তু পারে না। কিম্বা এখনও পারেনি। মৎস্যজীবী-দের আন্দোলনের এক বিশেষ দিক হল এর বহুমুখিতা। এক অর্থে এটা একটা অর্থ নৈতিক আন্দোলন, অন্য অর্থে সামাজিক, আর এক অর্থে এ এক পরিবেশ আন্দোলন। আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে আন্দোলনের এতগুলো দিককে অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব।"

প্রঃ "প্রযুক্তির অগ্রগতি যে সব দেশে বেশী হয়েছে, সে দেশের সংরক্ষণের সমস্যাও নিশ্চয় আরও ব্যাপক।"

"অবশ্যই। সংরক্ষণের সমস্যা আজ বিশ্বব্যাপী সমস্যা। পেরুর কথাই ধরা যাক। সেখানেই প্রথম হোয়াইট বেট নামে এক ধরনের মাছ ধরার জন্য পার্সজাল ব্যবহার শুরু হয়। '73 সালে পেরুর মৎসজীবীরা সারা পৃথিবীতে হোয়াইট বেট ধরতে সক্ষম হন। আর 80-র দশকের গোড়ায় এই হোয়াইট বেট প্রজাতি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে পেরু সরকার পার্সজাল ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। ততদিনে বুঝতে বাকি থাকে না যে পার্সজালের ব্যবহার সমগ্র সামুদ্রিক পরিবেশে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

"প্রকৃতি ও তার সম্পদের প্রশ্নগুলি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে কোন-টিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। তাই আমাদের কন্যাকুমারী অভিযানের শ্লোগান—**জল বাঁচাও, জীবন বাঁচাও।**"

সূত্র :

(1) ন্যাশনাল ফিশারমেন্স্ ফোরাম-এর বুকলেট—প্রোটেক্ট ওয়াটারস্—প্রোটেক্ট লাইফ

(2) এন. এফ. এফ-এর সভাপতি শ্রী টমাস কোচারির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এন. এফ. এফ-এর সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা :

1) Thomas Kochery, (Chairperson) National Fishermen's Forum, XXIII / 2127 Pallurthy, P. O.—Cochin—682006

2) পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রণব কুমার রায়, (সম্পাদক) এন. এফ. এফ, 25/1/C বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—700010 □

সভ্য অন্ধবিশ্বাস : জাতীয় ঐক্য ও অশোকস্তম্ভ

(পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ)

সৌমেন গুহ

"এক নৃতত্ত্ববিদ্ নরমাংসভোজী মানুষদের মাঝে কাজ করতে গিয়ে, কয়েক বছর বাদে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বন্ধুকে লিখলো—"এতো চেষ্টা করেও এদের মধ্যে মানুষের মাংস খাওয়া বন্ধ করতে পারলাম না। তবে হ্যাঁ, এখন এরা কাঁটা-চামচ ব্যবহার করছে!" আমাদের আলোচ্য সভ্য অন্ধবিশ্বাসের চেহারা বা প্রকৃতিটা ধরা পড়ে এই কাঁটা-চামচ দিয়ে নরমাংস ভোজের ধারণা থেকে সম্ভবত।

সভ্য অন্ধবিশ্বাস : পরিচয় ।। সৌমেন গুহ ।। বি-ও-বি, জানু-ফেব্রু, 1989.

অসংলগ্ন ভূমিকা

কিংবদন্তী ও বাস্তবতার আলোচনা মানেই কি বহু অতীতের সূত্র ধরে প্রাচীন কোনো লোকাচার বা গল্প-গাথার ব্যাখ্যা? আমাদের চিরায়ত ধারণা প্রায় তাই-ই। আর তা করতে গিয়ে প্রাচীন লোকাচারের মধ্যে হয়তো ধরা পড়ে কোনো 'অ-যৌক্তিক' ভিত্তি-কাহিনী—যার চালু নাম 'কু-সংস্কার'। যদিও 'সংস্কার' শব্দের সামনে 'কু' বিশেষণটি বাংলা ভাষায় উদ্ভাবন—সমতুল্য ইংরেজী শব্দ superstition-এ যা অনুপস্থিত। ইংরেজী শব্দটির নিকটতম বাংলা হতে পারতো—'ভ্রান্ত ধারণা' বা 'ভ্রান্ত-প্রথা'। বাংলায় 'কুসংস্কার' কথাটিতে রয়েছে প্রথমেই অধিকতর পরিত্যাজ্য, মূল্যায়নের রায় অনুযায়ী, বিশেষণ। ভ্রান্ত মানেই 'কু'—সমীকরণটি বঙ্গভূমির অনুশাসন। ব্যবহারিক জ্ঞানে হয়তো সত্যও বটে। কিন্তু 'কিংবদন্তী' (myth), 'অন্ধবিশ্বাস' (blind faith) আর 'কুসংস্কার' (superstition) শব্দাবলী সমার্থক নয়। বিশেষত superstition-এর বাংলা যদি 'কুসংস্কার' করি। কিংবদন্তী একটা ধারণা মাত্র—ব্যবহারিক জীবনে খুব ব্যবহার্য নয়। অন্ধবিশ্বাস বরঞ্চ পদে পদে ব্যবহৃত হয়—বিশেষত যে বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাসটি গড়ে উঠেছে, তার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার সময়। আর superstition একটা অভ্যাসের মতো এবং তার আশ্চর্যরকম স্থান-সময়াঙ্কে সীমাবদ্ধতা। কিন্তু 'অন্ধবিশ্বাস' হলো একটা স্বতঃসিদ্ধর মতো—যার ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধটি অন্যান্য সিদ্ধান্ত করে। অবশ্যই 'কিংবদন্তী' বা superstition একটা স্তরে 'অন্ধবিশ্বাস'-এর মধ্যে অন্তরীণ থাকে। তাই এ দুয়ের বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় অংশ 'অন্ধবিশ্বাস' আলোচনাতেও কাজে লাগে।

কিংবদন্তী ও বাস্তবতার আলোচনার ভূমিকায় দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী লিখছে—**"নিশ্চিত, যে আধুনিক প্রাচুর্যময় সমাজের আর্থনীতিক দর্শন যা ক্ষুধার্ত বিশ্বে বাড়তি শস্য ও আলুকে নষ্ট করে বা যে রাজনীতিক দর্শন চরম থার্মোনিউক্লিয়ার ডিটারেন্সকে মহিমান্বিত করে—আদিম কুসংস্কার তার থেকে মোটেই বেশি খারাপ কিছু নয়।"**

[D. D. Kosambi : *Myth and Reality*, Popular Prakashan, Bombay, 1962, পৃঃ 11]

এটা কোশাম্বীর নিছক উষ্মার প্রকাশ নয়। কিংবদন্তীর গভীরে বাস্তবতা খোঁজার কঠিন শ্রমে, সম্পূর্ণ অ-সাধারণ যোগ্যতায় কোশাম্বী নিজস্বতা নিয়ে এগিয়েছে। আর পাঁচজন যেভাবে ফ্রেজার বা ব্রিফ-র ঘাড়ে ভর করে এগোয় সাধারণত, কোশাম্বী বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেছে—ব্রিফ (Briffault) রচিত বিশাল গ্রন্থ *The Mothers*-এ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ঘাটতি, যার ফলে কখনো কখনো ব্রিফ-র সিদ্ধান্ত রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

সভ্য অন্ধবিশ্বাসের বিশ্লেষণে বিপদ আরো বেশী। 'প্রাচুর্যময় সমাজের' আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দর্শন কিংবদন্তীর স্রষ্টা বা প্রশ্রয়দাতা কি না—আমরা সে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অদ্ভুত এক দুষ্টচক্রে পড়বো। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান তো এই 'প্রাচুর্যময় সমাজের' দর্শন। যেমন, আধুনিক সামাজিক নৃতত্ত্বের অতি-তারকা ক্লদ্ লেভি-স্ত্রস্ (Claude Levi-Strauss) 'কাঠামোবাদ' নামে এক পদ্ধতির ধারক-বাহক-প্রচারক। এই 'কাঠামোবাদ' ইতিহাসের সচলতা (dynamics) বা স্থান-সময়াঙ্কের ভূমিকাকে স্থান দেয় না। পরিবর্তে, সম্পূর্ণ অনড় (static) ও বিষয়গত (subjective) বিশ্লেষণকে প্রশ্রয় দেয়। যার অনিবার্য পরিণতি—লেভি-ব্রুল (Levi-Bruhl) তত্ত্ব 'প্রাক্-যৌক্তিক মানসিকতা'! যার মূল কথা—প্রাচীন বা আদিম মানুষের একটা স্তরে যৌক্তিক চিন্তা করার শক্তি বা ক্ষমতা ছিলো না। এই সব অতি-তারকা সমাজবিজ্ঞানী বা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদদের শব্দের প্যাঁচের ভিতরের শূন্যগর্ভতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে সমাজবিজ্ঞানী স্তানিস্লাভ্ আঁদ্রেস্কি—সমাজবিজ্ঞান এক ডাইনীবিদ্যা! [দ্রষ্টব্য : Stanislav Andreski :

Social Sciences as Sorcery, Penguin, England, 1974.]

অতি সরলীকৃত ভাষায় কেউ বলতে পারেন, মূল ব্যাপার হলো সভ্য অন্ধবিশ্বাস বিশ্লেষণ হবে 'বিজ্ঞান'-ভিত্তিক। অর্থাৎ আধুনিক 'বিজ্ঞান'-ভিত্তিক। ইতিমধ্যেই আধুনিক দর্শনের একটি ধারা স্পষ্ট প্রশ্ন তুলেছে—আধুনিক বিজ্ঞান কি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন'? অর্থাৎ superstition বলতে আমরা যা বুঝি, তা থেকে স্বয়ং বিজ্ঞানই মুক্ত নয়! [দ্রষ্টব্য : Bertrand Russell : *Sceptical Essays*, Unwin, London, 1960, গ্রন্থে 'Is Science Superstitious ?' প্রবন্ধটি, পৃ. 25-31]

এদের মতামত একেবারে বাতিল করা বোধহয় যায় না। তাহলে বিজ্ঞানকে 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণে আনাই যাবে না। সংস্কার, কু-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বা কিংবদন্তী যাই-ই হোক না কেন—সেটা সংস্কৃতির অংশ, বৃহৎ অর্থে। আধুনিক বা প্রাচীন যাই-ই হোক না কেন। এটাকে বিশ্লেষণ করতে তবে কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো প্রজ্ঞার দরকার? ঠিক এ প্রশ্নটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মানুষ ও সভ্যতার বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের দর্শন প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ্ লেস্‌লি হোয়াইট আলোচনা করেছে। তার মতে বাস্তব সত্যকে বিচার করতে গেলে 'বিজ্ঞান'-কে 'বৈজ্ঞানিক' করে তুলতে হবে (কেউ কি কখনো আজ ভাবতে পারে বিজ্ঞানের 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বিচার করার কথা!)। অবশেষে হোয়াইট প্রচলিত বিজ্ঞানের শাখাগুলোর বাইরে নতুন এক পদ্ধতির প্রস্তাব রেখে নাম দিয়েছে—'সংস্কৃতিতত্ত্ব' বা Culturology! [দ্রষ্টব্য : Leslie A. White : *The Science of Culture*, Grove, London, 1949, সংকলনে 'Science is Sciencing' প্রবন্ধ, পৃ. 3-21.]

হোয়াইটের পদ্ধতিতে 'Sciencing' বাস্তবের কাঠামোকে খাপখাইয়ে নেওয়ার জন্যে বাস্তবকে বোঝার চেষ্টা করে তিনটি উপায়ে—(i) সার্বিক-ভাবে বাস্তবের স্থান-সময় চরিত্র ; (ii) স্থান চরিত্র ও (iii) সময় চরিত্র —বিশ্লেষণ মধ্যে দিয়ে।

যে কোনো কারণবশত, পরবর্তী সময়কালে লেস্‌লি হোয়াইটের 'সংস্কৃতিতত্ত্ব' বিদ্বৎসমাজে দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু—সভ্য অন্ধ-বিশ্বাসের বিশ্লেষণে ঐ Sciencing-এর পদ্ধতি অবিরাম ব্যবহার্য। না হলে—বিশেষ একটি তত্ত্বের কাঠামো বিশ্লেষণের সচলতাকে দুর্বল বা একমুখী করে তুলবে।

সভ্য অন্ধবিশ্বাস শুধু সমসাময়িক নয়—'আমাদের' সমাজের মানব গোষ্ঠীর ব্যাপার। 'আমাদের' অর্থাৎ—বর্তমান লেখক এবং, যাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত। এটা ভীষণ নতুন কতকগুলো সমস্যা নিয়ে আসে—যা বিচ্ছিন্নভাবে 'ওদের' সমস্যা বিচারে দেখা যাবে না। 'ওরা' হলো—আদিবাসী, কৃষক, শ্রমিক, বস্তিবাসী ইত্যাদি। 'ওদের' ও 'আমাদের' গোষ্ঠীর বিশ্বাস-বিশ্লেষণ ষোলো আনা এক নয়। তাই বহিঃশর্ত হিসেবে রয়েছে—সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক চাপ বা সমস্যা।

এই সমস্যাবলী অন্যভাবে বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'সভ্য অন্ধবিশ্বাস' যা দিয়েই শুরু করা হোক, শেষ করা প্রয়োজন 'সভ্য ও সভ্যতা' সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাসের আলোচনা দিয়ে। আদতে 'সভ্যতা', এটারই কতটা সত্যতা আছে ?

সম্প্রতি, খুব সম্প্রতি পশ্চিমী সমাজতত্ত্ব power বা 'ক্ষমতা' বিকাশের পটভূমিতে সমাজবিকাশ বিচার করছে—যা চিরায়ত মার্কস-বাদের অন্তর্বস্তুর কাছাকাছি চলে আসে। বিশ্বাসের তেমনি এক 'ক্ষমতা' বিকাশের ইতিহাস থাকবে। ক্ষমতাশীল বিশ্বাসের গায়ে আঘাত করা মানে—শেষ অর্থে ক্ষমতা-গোষ্ঠীকে আঘাত করা। তাই বহিঃশর্তগুলো সামাজিক চাপ। চাপ ঠিক শুধু সমাজের ব্যাপারে নয়, ব্যক্তির ভেতরেরও

"চাকরি যাওয়া, প্রাণ যাওয়া বা সুখ যাওয়ার ভয়ে—একটা অসম্ভব বা অবাস্তবকে বিশ্বাস করা ও করানো সব থেকে সত্য, আধুনিক কালেই। স্পষ্ট করে বললে—বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সামান্যও ক্ষতি হয়, এমন সত্যের সপক্ষে লড়ে না। যার ফলে আমাদের পক্ষে সভ্য অন্ধবিশ্বাসের মূলে যাওয়ার উপকরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়।"

খুব শক্তিশালী। চাকরি যাওয়া, প্রাণ যাওয়া বা সুখ যাওয়ার ভয়ে —একটা অসম্ভব বা অবাস্তবকে বিশ্বাস করা ও করানো সব থেকে সত্য, আধুনিক কালেই। স্পষ্ট করে বললে—বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সামান্যও ক্ষতি হয়, এমন সত্যের সপক্ষে লড়ে না। যার ফলে আমাদের পক্ষে সভ্য অন্ধবিশ্বাসের মূলে যাওয়ার উপকরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। একটা কার্যকরী পদ্ধতি নিচ্ছি এখানে :

(1) **নির্দিষ্ট বিশ্বাসটির প্রকাশ**। এটা ধরা খুব কঠিন নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা বাঞ্ছিত।

(2) **বিশ্বাসটির ঐতিহাসিক পটভূমি**। এটা বলা খুব কঠিন। ইতিহাস লিখেছে বুদ্ধিজীবীরাই। তথ্যগুলোকে খতিয়ে না দেখলে, তাদের উপকরণ গ্রহণযোগ্য নয়।

(3) **বিশ্বাসটির অন্ধত্ব**। যদি বিশ্বাসটি সত্যের বিরোধী হয়—এটাকে অন্ধ বলতে হবেই।

(4) **সম্ভাব্য বাঞ্ছিত বিশ্বাস**। এটা বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত মতামত।

এ পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণের জন্যে আমরা বেছে নিচ্ছি আপাত রাজনীতিক একটি বিষয়বস্তুকে। এটা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে

ব্যবহৃত হয় বলেই রাজনীতিক—কিন্তু মূলত ঐতিহাসিক সত্যকে গোপন করেই বিষয়টির নব কলেবর। আমাদের বিবেচ্য বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা না-করার ভয়টা কিন্তু রাজনীতিক, অথবা অন্ধবিশ্বাস উদ্ভূত।

ধাঁধা

প্রশ্ন—বলুন তো, প্রাচীন ভারতে এক লক্ষ মানুষের প্রাণদান ও দেড় লক্ষ মানুষের আশ্রয়হীনতার মূল্যে কোন্ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি বদলায়—অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধটি ও স্বাধীনতা-প্রিয় দেশটি ইতিহাসবিস্মৃত হয়?

উত্তর—কলিঙ্গের স্বাধীনতা যুদ্ধ, সম্রাট অশোকের বিরুদ্ধে।

ঘটনা : পবিত্র প্রতীক

কলকাতার রিক্সায় যে রেজিস্ট্রেশন প্লেট থাকে, তার জাতীয় প্রতীকে মানুষের পা-লাগার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি একটি অভিযোগ আসে।[1]

ভারতের এই জাতীয় প্রতীকটি সার্ভিস স্ট্যাম্প, সরকারী খাম বা চিঠিতে, এমন কি ফিল্ম ডিভিশনের তথ্যচিত্রে দেখবেন—জোরালো তানপুরার আওয়াজের সাথে জাতীয় প্রতীকটি আলোর ছটায় দ্রষ্টব্য। তিনটি সিংহ মার্কা একটি প্রতীক। প্রতীকটির পাদদেশে একটি চক্র—এ চক্রটিই আমাদের জাতীয় পতাকার মাঝখানে এখন। আসলে এ প্রতীকটি নেওয়া হয়েছে সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত সারনাথ স্তম্ভ থেকে—চক্রটিও সেখানকার। এবং—ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের আপাত ভাবভঙ্গী অশোকের 'ধর্মবিজয়' অনুসরণে। এগুলোকে নিটোল একটি প্রচারে ভারতের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যকে 'বাঁচাতে' ব্যবহার করা হয়। অতএব, যা ঘটলো—পাঞ্জাবে বা দার্জিলিঙে কোনো আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় একটি বিশ্বাসকে, ভিত্তি করে তোলা হয়—এক জাতি এক প্রাণ ভারত। আর বাকীটা রাজনীতি! প্রথমেই জানিয়ে রাখি, সারনাথের যে সিংহচূড়া আজ ভারতের জাতীয় প্রতীক—সেই স্তম্ভলেখেই লেখা আছে[2]

(তৃতীয় লাইন)…'কেউ সঙ্ঘকে ভাগ করতে পারবে না।'
(চতুর্থ লাইন)…'সঙ্ঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সাদা পোষাক পরতে হবে
এবং বাসস্থানের বাইরে থাকতে হবে।'

অর্থাৎ বৌদ্ধ সংঘ বাঁচানোর জন্যে কোনো ধরনের মতপার্থক্য সহ্য করতে ধর্মাশোক রাজী নয়—রয়েছে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর গৈরিক পোষাক পরার, নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকার অধিকার হারাতে হবে—এমন কড়া শাসনের অস্তিত্ব তখনই।

অশোকের ইতিহাসের ক'টি ব্যাপার এখানে বলে নেওয়া দরকার। অশোকের নামাঙ্কিত একটি মাত্র স্তম্ভলেখ ভারতে পাওয়া গেছে [Maski inscription—'দেবনম্প্রিয় অশোক']—বাকী সমস্ত শিলালেখ, গুহালেখ, স্তম্ভলেখে কিন্তু অশোকের নাম পাওয়া যায় না। অশোক সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন পুঁথি বলতেও অনেক পরবর্তী বৌদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থ 'দিব্যাবদন' ও শ্রীলঙ্কার প্রাচীন পালিগ্রন্থ। শিলালেখগুলো ও পুঁথি থেকে জানা যায়—অশোকের তিনটি নাম—প্রিয়দর্শ, অশোক এবং প্রিয়দর্শী। পালিগ্রন্থের ধারানুযায়ী প্রিয়দর্শ নামের রাজকুমারের দু'বার রাজ্যাভিষেকের সময় নাম হয়েছিলো অশোক ও পরে প্রিয়দর্শী। কোনো অবস্থাতেই 'প্রিয়দর্শী' অশোকের বিশেষণ বা উপাধি ছিলো না। যদিও চলিত বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষণ হিসেবে লেখা হয় ['প্রিয়দর্শী অশোক'। যেমন : 'প্রিয়দর্শিন্'—an epithet of King Asoka (V. S. Apte: *The Practical Sanskrit-English Dictionary*, Bombay, 1912)]। ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার অনৈতিহাসিকতা—বিশ্লেষণের আরেক বাধা। প্রাচীন গ্রন্থানুযায়ী এই 'অশোক' এক সৎ-ভাইকে (বা নিরানব্বই জন ভাইকে) হত্যা করে রাজা 'অশোক' হয়েছিলো—যার সম্পূর্ণ ইতিহাস ভারতের শিলালেখগুলিতে পাই না। অর্থাৎ রাজা প্রিয়দর্শীর ইতিহাসই পাই। এই প্রিয়দর্শীর নামই কলিঙ্গ-যুদ্ধের বিবরণের শিলালেখে পাই! মজার ব্যাপার হলো—সারনাথের স্তম্ভলেখে 'দেবনম্প্রিয়' কথাটির পরে রাজার নামের জায়গাটা ভাঙা। আমরা ঠিক জানি না এটা 'অশোক' না 'প্রিয়দর্শী'-র সময়কালে। **সময়ের সাথে সাথে ভারতের ইতিহাসে অশোক নামটির প্রাধান্য বাড়ে**। আর নানা ইতিহাসের ফাঁক রেখে 'প্রিয়দর্শী' এক পবিত্র বিশেষণ—যা লক্ষ্যণীয়, অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থায় এক 'প্রিয়দর্শিনী' প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাচর্চায়।

ভারতের জাতি জাতীয়তা : প্রাক্-ইতিহাস

ভারতপ্রেমী ইতিহাসবিদ এ. এল. বাশামকে একবার তামিল জাতীয়তাবাদ (অর্থাৎ তামিল 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'!) সম্পর্কে মতামত দিতে বলা হয়। এক অ-সাধারণ নিবন্ধে[3] বাশাম প্রশ্নটি হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের পটভূমিতে বিচার করে মন্তব্য রাখে—"আমি মনে করি, ভারতে সমগ্র ইতিহাসে, একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারলে ভারত সুখী ও সমৃদ্ধ হয় এটা অসত্য, বা অন্ততপক্ষে অপ্রমাণিত।"

বাশামের মতোই প্রাক্তন কূটনীতিবিদ পখ্হামার লক্ষ করেছে[4] এবং ভারতের সমগ্র অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করেই—"ভারতে, একটি কেন্দ্রীয় সরকারের (ভারতের সম্রাটের) অধীনে সমগ্র উপ-মহাদেশকে রাখার ধারণা কখনোই ব্যবহারিক গুরুত্ব লাভ করেনি।"

বাশাম ও পখ্হামার পেশা ও পরিসরে (যথাক্রমে মোট 10 এবং 678 পৃষ্ঠা) গুণগত ও পরিমাণগতভাবে আলাদা হলেও একই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে উভয়েই একই বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করেছে। ধারাটিকে সমর্থন করে অবশ্যই আরো অজস্র তথ্য যোগ করা যায়—বা বিশ্লেষণকে উন্নত করা যায়। যেমন—

ভারতের মানচিত্রটি হাজার হাজার বছর ধরে এক ছিলো না।[5] এমন কি ভারতবর্ষ বলে, মহাকাব্যে এক খণ্ড অঞ্চলকেই বোঝাতো।[6] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই মহাকাব্যেই আজকের ভারতের নানা অঞ্চল বা প্রদেশ সম্পর্কে

কটূক্তি করা হয়েছে[7]—কটূক্তি করা হয়েছে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে এমনি করেই[8] (যদিও মহাকাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রকে অতি প্রাচীন বলে ধরার কারণ নেই)[9]। প্রাচীন যে সব রচনাকে বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ বা secular সাহিত্য, যার জন্যে সঠিক অর্থেই ভারত গর্ব করতে পারে টেকনিক্যাল উন্নতির—সেই অর্থশাস্ত্র[10] বা নাট্যশাস্ত্রে[11] বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক বা রাজনীতিক বিভেদীকরণ। আজকের রক্ষণশীল বা অসহিষ্ণু রাজনীতিক চিন্তার থেকে অনেক বেশী বিচ্ছিন্নতাবোধ বা স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিলো সমাজ ও সংস্কৃতির মজ্জায় মজ্জায়।[12] ইতিহাসবিদ্‌রা কখনো কখনো সময়াঙ্ক নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করলেও, গ্রন্থ বা রচনাগুলির স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের চেষ্টা খুব বেশী করেনি।[13] বা করলেও তার গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকেছে। ভেবে দেখা হলো না—একটা সময় নানা জনপদ বা অঞ্চলের মধ্যে প্রখর বিভেদের প্রমাণ-রচনা হিসেবে আজকের বহু সম্মানিত বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ।

খণ্ড-বিখণ্ড স্বাধীন জনগোষ্ঠীকে একবার অন্তত একক সাম্রাজ্যের অধীনে আনার চেষ্টা হলো।[14] আর সে চেষ্টার বর্থ্যতার প্রতিমূর্তি সম্রাট অশোক।

অশোক ও ঐক্য : কলিঙ্গ

ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের সুবিধের জন্যে যে সব দুঁদে ইতিহাসবিদ্‌দের লালন করতো—বিখ্যাত ভিন্সেণ্ট স্মিথ তার একজন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও আকবরকে ভারতের রাজনীতিক ঐক্যবদ্ধতার প্রতিভূ হিসেবে দেখিয়েছে—বাশামের বিশ্লেষণে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-বিদ্‌রা একই জিনিস উল্টো স্বার্থে দেখিয়েছে।[15]

অশোক সম্পর্কে কোশাম্বী অনেক স্পষ্টবক্তা।[16] আর্থনীতিক ভাঙনে হালে পানি না পেয়ে—অশোক নতুন কায়দায় শাসনের ভেক ধরলো—ধর্মাশোক।[17] সমস্ত ভারতকে দাপটে পায়ের তলায় রাখার উপায় ছিলো না। অশোকের শিলালেখগুলোর ভাষা অঞ্চল অনুযায়ী বিভিন্ন, ও লিপি দু' রকমের।[18] রাষ্ট্রভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করেনি অশোক। এ সব করার আগে সে কেন্দ্রীয় শক্তির পরীক্ষা করলো কলিঙ্গর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। বৃহত্তম ধাক্কাটা খেলো সেখানেই।

অশোক-পূর্ব সময়ে কলিঙ্গ ছিলো একচ্ছত্র মগধের শিরঃপীড়া, সহজে কোনোদিন কলিঙ্গ এর অধীনে ছিলো না।[19] লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিলো—অশোকের অন্যতম শিলালেখে সে কথা লিখতে হলো। জয় করা গেলো—রাজাহীন অধীনতায় তোসলি বা কলিঙ্গতে রাজা নয়, এক আমলা বসালো অশোক—'নগর ব্যবহারিক'।[20]

সম্ভবত সে সময় বা তার কিছু আগে মগধে প্রলয় দুর্ভিক্ষে ঘটলো বিরাট exodus—জেন শাস্ত্রকার ভদ্রবাহু ভুখা-মিছিলের সাথে চলে গেলো দক্ষিণে।[21]

কলিঙ্গের এ সময়ের ইতিহাস আজও অন্ধকারে।[22] ঠিক অশোক-পরবর্তী সময়েই কলিঙ্গ সম্পূর্ণ স্বাধীন।[23] কয়েক শত বছর ধরে কলিঙ্গকে কেউ পরাধীন করতে পারেনি। অশোক জানতো সারনাথের সাথে বুদ্ধের নাম জড়ানো।[24] সেই সারনাথেই দ্বিমতপোষণকারীদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু অশোক ফরমান জারি করলো—যা আজ বিখ্যাত অশোক-স্তম্ভ।

আগেই লিখেছি—ফরমানটা ভারতের ঐক্য সম্পর্কে নয়—বরঞ্চ একটি মতাদর্শ ও তার গোষ্ঠী সম্পর্কে।

কিংবদন্তী ও বিশ্বাস

বুদ্ধ-সম্পর্কিত সারনাথ, থেকে অশোক-সম্পর্কিত সারনাথ, সেখান থেকে ভারতের জাতীয় প্রতীক। এটা সচেতন সমীকরণ।

ইতিহাসবিদ্ বাশামের ভারতের ঐক্য সম্পর্কে বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিলো ড্যানিয়েল আর্গভ্ নামে এক ছাত্র। নিজের নতুন বিচারধারায় ছাত্রটির প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে, বাশাম লিখছে[25] "দ্রুত উন্নয়নশীল জনগণের মধ্যে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী দ্রুত বিকাশ লাভ করে। তেমনি একটা কিংবদন্তী হলো, একটা কেন্দ্রীভূত বা বলা যায় কর্তৃত্বমূলক একক সরকারের অধীনে যেমন মৌর্য, গুপ্ত, মোগল, বৃটিশ, উপ-মহাদেশের অধিকাংশ ঐক্যবদ্ধ হলেই একমাত্র ভারত সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। এই কিংবদন্তীটা সেই ভারতীয় বা পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদরা সযত্নে প্রচার করে, এ শতকের শুরুতে যাদের সব থেকে প্রভাব ছিলো ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার ওপর।" যেটা ঐতিহাসিক কিংবদন্তী, সেটাকে চলছে মাজা-ঘষা করে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা। অশোক-স্তম্ভের প্রতীক ব্যবহার করা হলো সেই সর্ব-ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের আবেগটুকুকে ব্যবহার করার জন্যে। সংগ্রামে ভারত এক—শাসনে নয়। এ কথা আর বলা হবে না।

বর্তমান লেখক কলিঙ্গর ইতিহাস রচনার উপকরণের খোঁজে যতোটুকু ঘুরেছে—আমলাতন্ত্র দেখেছে প্রতি পদক্ষেপে। ধবলগিরি, যেখানে কলিঙ্গর মানুষেরা প্রাণ দিয়েছে—সেখানে অশোকের শিলালেখের এখন ফটো তোলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ।[26]

কল্পনা করি—জাতীয় প্রতীক শুধু নয়, অশোকস্তম্ভ বা অশোক, তার সাথে কলিঙ্গর আলোচনা করার অধিকার 'আমাদের' আর থাকবে না। যার উল্টো দিকে—সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের সন্ধানে নয়, স্বাধীনতার আকাঙ্খা নিয়ে নয়—কৃত্রিম ঐক্য গঠনের জন্যে রঙবেরঙের মিছিল। হয় এরা বিশ্বাস করে, না হয় করাচ্ছে ঐতিহাসিক কিংবদন্তীটিকে। শাসকদের সাথে হাত মিলিয়েছে প্রগতিশীল সমাজসেবী, শিক্ষক, গণতন্ত্রী, বা বিজ্ঞানী। জাতীয় ঐক্য ভেতরের জিনিস—সরকারের সাজানো স্তম্ভ নয়। যে সাজানো স্তম্ভ চাপিয়ে দিয়েছে হাজার সমস্যা—রাষ্ট্রভাষা থেকে রাজ্য পুনর্গঠন পর্যন্ত। সব সমস্যাই তোমরা ভাবো—কিংবদন্তীকে বিশ্বাস করে! শাসকরা শিখিয়েছে।

অযাচিত

বর্তমান নিবন্ধে কোন পরামর্শ রাখার অবকাশ রাখা উচিত নয়। অযাচিতভাবেই বলতে হয়—একেবারে নীচতলার মানুষদের ঠিক যেভাবে ঐতিহাসিক বিকাশ হয়েছে, তার বর্তমান সময়াঙ্ক ও স্থানাঙ্কে, আসুন কিছু সমস্যার আলোচনা করি। ওপর থেকে চাপানো সমস্যাটাকে মূলত

অগ্রাহ্য করেই। ভারতের ইতিহাস-সংস্কৃতি সংক্রান্ত সামান্য ইতিবাচক কাজ সেভাবেই করা সম্ভব ॥

টীকা ও নির্দেশিকা

1. *The Telegraph*, 18 January 1989. এ খবরটির ঠিক নীচেই প্রজাতন্ত্র দিবসে সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিষয় জানানো হচ্ছেn—Uity in Diversity !
2. Bhattacharya, Sachchidananda, *Select Asokan Epigraphs*, Firma KLM, Calcutta, 1969, পৃ. 79.
3. Basham, A. L. 'Some Reflections on Dravidians and Aryans.' গ্রন্থ *Studies in Indian History and Culture* ; Sambodhi, Calcutta, 1964, পৃ 20-29.
4. Pochhammer, Wilhelm von, *India's Road to Nationhood*, Allied, New Delhi, 1981, পৃঃ 652
5. এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ : Law, B. C., *Historical Geography of Ancient India*, Societe, Asiatique, Paris 1968. এবং Raychaudhury, H. C., *Political History of India*, University of Calcutta, 7th edn., 1972.
6. Law, উপরোল্লিখিত, পৃ. 11.
7. যেমন 'উত্তর কুরু' অঞ্চলে অনার্যদের কামাচার [মহাভারত, 12.102. 26] বা, 'অঙ্গ' অঞ্চলে লোকে বৌ-ছেলে মেয়েদের পরিত্যাগ করে, বেচে দেয় [ঐ, 7.45 14-16 ; 28 ; 34]।
8. যজ্ঞের উপযুক্ত দেশের বাইরে সব 'ম্লেচ্ছদেশ' [মনুস্মৃতি 2.23]
9. আনুমানিক সময়কালের জন্য, যেমন : Macdonell, A. A., *A History of Sanskrit Literature*, Motilal, Delhi, reprint, 1962, পৃ 240-42, 364.
10. কম্বোজ, সুরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশের মানুষ 'সংঘ'-বদ্ধ, এবং রাজার উচিত গুপ্তচর (spy) লাগিয়ে দেশগুলির মধ্যে দোষ, রোষ, হানা-হানির জন্ম দেয়া—এবং যাতে এক সংঘ অপর সংঘের অপবাদ করে [অর্থশাস্ত্র, 11. 1. 160-61]!
11. বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের গায়ের রঙ ছিলো স্পষ্টতই আলাদা [নাট্যশাস্ত্র, 21.110-12]; আবার জাতিভেদ অনুসারেও গায়ের রঙ আলাদা [ঐ, 21-113]!
12. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থকার কৌটিল্য প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনার যে বিশাল বিশদ পদ্ধতি আলোচনা করেছে, তা সম্ভবত আজও ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, যে পূর্বোল্লিখিত অংশে, নিখুঁত করে, প্রত্যেক মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে কলহ, বিভেদ কিভাবে ঘটাতে হয়—তার চক্রান্তের টেকনিক্যাল উপায়ের বর্ণনা। আমার ধারণা—প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার উৎস অতি প্রাচীন [ইতিহাসবিদ্ ইরফান হাবিবের সাম্প্রতিক বক্তব্যের সাথে একমত নই]। অবশ্যই 'অর্থশাস্ত্র' অতীতের পবিত্র অশোকের শাসনকালেরই সম্ভবত।
13. ভারতীয় মহাকাব্য, ভারতীয় শাস্ত্র ইত্যাদি বলতে এ কারণেই অভ্যস্ত হয়েছি। মুঘল আমলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে গেলেও —আমরা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকে বলি 'ভারতীয় সঙ্গীত'। অপরটি 'কর্ণাটিক' !!
14. রূপরেখায় আলোচনা : Thapar, Romila, *A History of india*, Penguin, Harmondsworth, 1972, চতুর্থ অধ্যায়।
15. Basham, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ 27-28. উল্লেখ্য—সর্বভারতীয় জাতি বা জাতীয়তার অনুভূতি বৃটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা থেকে। এবং 1947 সালের পর দশ বছরের মধ্যে রাজ্য পুনর্গঠন নিয়ে ও পরে আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবী শুরু হয়ে গেছে।
16. Kosambi, Damodar Dharmananda : *An Introduction to the Study of Indion History*, Popular, Bombay, দ্বিতীয় সংস্করণ 1975, পৃঃ 197-209. অথচ কোশাম্বী কলিঙ্গ সম্পর্কে এতো সংক্ষিপ্ত—যা একেবারে অনভিপ্রেত।
17. স্কুল পাঠ্য গ্রন্থে 'চণ্ডাশোক' ও 'ধর্মাশোক' পড়ানো হয়—শিলা-লেখগুলো যৎসামান্য ব্যাখ্যা না করে। অশোক 'ধর্মবিজয়' করার কথা শিলালেখে উল্লেখ করেছে, যে ধর্মের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্‌রা একমত নয়। দ্রষ্টব্য : Bhattacharya, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 8. কোশাম্বী লিখছে—'these edicts manifest something beyond religion.' দ্রষ্টব্য : Kosambi, উপরোল্লিখিত, পৃ. 201, এবং পৃ. 205.
18. স্বল্প পরিসরে শিলালেখের উপভাষার আলোচনা : Chatterji, Suniti Kumar *A Middle Indo-Aryan Reader*, Calcutta University, 3rd edn. 1960, Part II পৃ. 103-6.
19. Law, পূর্বোল্লিখিত, পৃ 186-87.
20. Bhattacharya, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 99, টীকা ; এবং Bhandarkar, D. R., *As'oka*, University of Calcutta, 4th edn., 1969, পৃ. 329, টীকা।
21. চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত কুমার (অনু), কল্পসূত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1953, ভূমিকা, পৃ. 104-5.
22. খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ইতিহাসের মূল উপাদান অশোকের শিলালেখ ও তার পরে রাজা খারবেল-র হাতীগুমফায় শিলালেখ। এক সময় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে (History of Orissa, vol, I এবং II) পরবর্তী আটশ' বছরের ইতিহাস একেবারেই অন্ধকার। সম্প্রতি তার থেকে খুব বেশী এগোয় নি। সযত্ন

[17 পৃ: দেখুন]

খাদ্যে ভেজাল : একটি পর্যালোচনা

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালার বুড়োশিবতলার গরীব ভাণ্ডারের কথা নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি আমরা ভুলিনি। ঐ দোকানেরই সর্ষের তেল খেয়ে বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছিলেন। ঠিক একই ধরনের বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছিলো 1972 সালে এই কলকাতারই দমদম ময়রাপাড়া এলাকায়। দুক্ষেত্রেই তেলের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে মেশানো হয়েছিলো ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট (TCP) নামে একটি প্রায় বর্ণহীন তৈলাক্ত তরল যেটি প্লাষ্টিকশিল্পে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রায় 15,000 মানুষ 1930 সালে একইভাবে এই তরলের বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এটি শরীরে গেলে গা-বমিভাব, বমি ও উদরাময় দেখা যায়, তাছাড়া স্নায়ুর কার্যকারিতা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেহালার এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি একটি বাস্তব সমস্যাকে চোখের সামনে নিয়ে এসেছে। নানা জায়গায় খাদ্যে ভেজাল প্রসঙ্গে আলোচনাচক্র ইত্যাদি শুরু হয়েছে।

শুধুমাত্র যে ভোজ্যতেলেই ভেজাল দেওয়া হয় এমন নয়। সাধারণত যে সব খাদ্যে আমাদের দেশে ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে তার একটি সারণী দেয়া হলো (পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খাদ্য উৎপাদন অনেকাংশে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় এবং নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও বেশ কার্যকরী। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক খাদ্যেই ভেজাল থাকে অথবা প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ থাকে না। ভেজাল বলতে আমরা সাধারণত বুঝি খাদ্যে কোনো বিজাতীয় (foreign) বস্তু ইচ্ছাকৃতভাবে মেশানো অথবা তা থেকে কোনো মূল্যবান উপাদান সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন (Prevention of Food Adulteration Act, সংক্ষেপে PFA)—অনুসারে শুধু তাই নয় ; উৎপাদন, সংরক্ষণ, নিষ্কাষণ, শোধন, মিশ্রণ, প্যাকিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া, পরিবহন ও বণ্টন—এর যে কোনো পর্যায়ে খাদ্যে দূষণ বা অবাঞ্ছিত মিশ্রণ (contamination) ঘটলে তাকেও ভেজাল বলা হবে।

খাদ্যের গুণ নির্ণয়ের জন্য সরকার থেকে দু'টি মান বা standard স্থির করা হয়েছে :

i) PFA—Prevention of Food Adetlaration Act, এটি চালু হয় 1955 সালে ;

ii) FPO—Fruit Products Order, এটি চালু হয় 1946 সালে।

খাদ্যের Standard বা মাননির্ধারক দু'টি সংস্থা হ'ল

i) ISI—Indian Standards Institution (অধুনা Bureau of Indian Standards)

বিভিন্ন সময়ে সব্জী ও খাদ্যবস্তুর মান নির্ধারণ করে থাকে।

ii) Agmark—ডিরেক্টরেট অফ মার্কেটিং অ্যাণ্ড ইন্সপেক্শন, (ভারত সরকার) কৃষিজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ করে।

ভেজাল রঙ

লালচে হলুদ রঙের অমৃতি জিলিপি বা হাল্কা হলুদ রঙের কমলা ভোগের নামে অনেকের মতো আমাদের রসনায় জল এলেও এ দুটিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ ওতে মেশানো রঙটি হলো কিশোরী রঙ বা মেটানিল ইয়েলো যার বাক্সের ওপর লেখা থাকে Poison।

প্রতি বছর যে সমস্ত ভেজাল দেবার ঘটনা পি. এফ. এ. আইন লঙ্ঘনের দায়ে ধরা পড়ে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটে রঙে ভেজাল দেবার ঘটনা। খাদ্যদ্রব্যে রঙ মেশানো হয় সাধারণত ক্রেতাদের, বিশেষত শিশুদের কাছে সেগুলির আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে, এবং অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের জিনিসকে এই কৌশলে বেশি দরে বিক্রি করার জন্যে।

পি. এফ. এ. আইনানুসারে আইসক্রিম, ডিমের খাবার, বিস্কুট ইত্যাদির মতো কিছু নির্দিষ্ট খাবারের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং তাও অনুমোদিত এগারোটি রঞ্জক পদার্থের (Dye) মধ্য থেকে।

অনুমোদিত রঞ্জকগুলি হল :

নীল : Brilliant Blue FCF, Indigo Carmine ; সবুজ : Fast Green FCF, Wool Green BS ; হলুদ : Tartrazine, Sunset Yellow FCF ; লাল : Amaranth, Carmoisine, Erythrosine, Fast Red E, Ponceau 4R.

এই রঞ্জক দ্রব্যগুলি মেশানো যেতে পারে অনুমোদিত মাত্রায় অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রতি কিলোগ্রাম (নীট) ওজন পিছু 0·2 গ্রামের বেশি নয়। এই মাত্রাকে লঙ্ঘন করা কখনোই উচিত নয় ; কারণ কোনো রঞ্জক পদার্থই চূড়ান্তভাবে নিরাপদ নয়, তাই 'নিরাপদ মাত্রা' বজায় রাখা উচিত। এমন কি বর্তমানে যেগুলিকে নিরাপদ বলে ভাবা হচ্ছে সেগুলিকেও ভবিষ্যতে তত নিরাপদ নাও মনে করা হতে পারে। Amaranth-এর মতো নিরাপদ রঙও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হতে পারে, এমন কি সম্ভাব্য পিতা-মাতার জিনে এমন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে যাতে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম হতে পারে। মস্কো ইনস্টিটিউট ফর নিউট্রিশন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ভেষজ প্রশাসনের (Food and Drug Administration) পরীক্ষায় এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 1975 সালের জুন মাস থেকে পরিবর্তিত পি. এফ. এ. আইনে আই. এস. আই. ছাপহীন সমস্ত রঙকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখনীয় যে আলকাতরা-জাত এগারোটি কৃত্রিম রঙ-এর বাইরে, কিছু কিছু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক রঙ-এর ব্যবহারও PFA অনুমোদিত।

সারণী

শ্রেণী	খাদ্যবস্তু	যা ভেজাল হিসাবে মেশানো হয়
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য	দুধ	জল, স্টার্চ (আলু ও রাঙালু), আলকাতরাজাত রঙ
	গুঁড়ো দুধ, কণ্ডেন্‌স্‌ড	বাড়তি আর্দ্রতা, স্টার্চ এবং কম স্নেহ পদার্থ যুক্ত দুধ
	মিল্ক, খোয়া, ছানা, আইস-ক্রিম	স্টার্চ পেপার, মাঠা তোলা দুধ, অননুমোদিত রঙ ও গন্ধ, কৃত্রিম Sweetener, স্টার্চ
	মাখন, ঘি	বাড়তি আর্দ্রতা, বনস্পতি, প্রাণী-দেহের চর্বি, নিষিদ্ধ রঙ, স্টার্চ
উদ্ভিজ্জ তেল ও স্নেহপদার্থ	margarine	বাড়তি আর্দ্রতা
	বনস্পতি	প্রাণীদেহের চর্বি
মশলা	গোটা হলুদ	লেড ক্রোমেট বা মেটানিল ইয়েলো দিয়ে পালিশ
	হলুদ-গুঁড়ো	নিষিদ্ধ রঙ, গৈরিক মাটি, বালি, স্টার্চ ইত্যাদি
	গরম মশলা, কারি পাউডার, পাঁচমিশালী মশলা	স্টার্চ, বালি
	গোটা ধনিয়া	সালফার ডাই অক্সাইড, সবুজ রঙ
	গোটা লঙ্কা	তেলে দ্রবণীয় কৃত্রিম রঙ (Sudan I)-এর পালিশ
	লঙ্কা গুঁড়ো	কৃত্রিম লাল রঙ, স্টার্চ
	সর্ষে	Argemone seeds
	হিং	বালি, চক, resin, গঁদ
খাদ্যশস্য	গম, চাল, আটা, ময়দা	পাথর, বালি, কাঁকর, মাটি চকগুঁড়ো
	অড়হর ডাল, বেসন, ছোলার ডাল	মেটানিল ইয়েলো দিয়ে রঙ করা খেসারির ডাল, বালি, ভুট্টা
অ্যালকোহল-হীন পানীয়	Soft drinks	অননুমোদিত মাত্রায় স্যাকারিন, নিষিদ্ধ রঙ ও গন্ধ, ধাতব দূষণ (সীসা, আর্সেনিক)
	চিঁড়া, মুড়ি	ডিটারজেন্ট (সাদা করার জন্য)
	তোপসে মাছ	হলুদ রঙের জন্য মেটানিল ইয়েলো

সাধারণত যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভেজাল রঙ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তার মধ্যে রয়েছে—মাখন, পনীর ; কেক, বিস্কুট, টফি, পাঁপড় ও অন্যান্য ভাজা ; মিষ্টান্ন ; জ্যাম, জেলি, মার্মালেড ; টিনে ভরা ফল ও সবজি ; সস্, কেচাপ, টম্যাটোজাত খাদ্য।

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে রঙে ভেজাল দেওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা কত জরুরী।

ভোজ্য তেলে ভেজাল

আমাদের দেশে সম্ভবত সবচেয়ে বিপজ্জনক ভেজালের ঘটনা ঘটেছে ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে। ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট মেশানোর কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও নানাভাবে তেলে ভেজাল দেওয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটে সর্ষের তেলের সঙ্গে শিয়ালকাঁটার তেল মেশানোর ঘটনা। এই তেল দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণের ফলে dropsy বা শোথ নামে একটি রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই রোগে দেহের কোষ সমষ্টি বা 'টিস্যু'তে জলীয় তরল জমা হতে পারে। ভোজ্য তেলে খনিজ তেল মেশানোও সম্ভবত ব্যাপক। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব ক্ষেত্রে, বলতে গেলে, অসহায়। কেননা তেলে ভেজালের উপস্থিতি বোঝবার কোন উপায়ই প্রায় সাধারণ মানুষের হাতে নেই।

ধাতব দূষণ

আর্সেনিক॥ "দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুরের কাছে একটি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক প্রভাবজনিত রোগ ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।...বিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন যে ঐ গ্রামের টিউবওয়েলের পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে।" এটি 'সেঁকো বিষের কবলে পশ্চিমবঙ্গ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনের অংশ, যেটি 'বিওবি' মার্চ-এপ্রিল 1984'তে প্রকাশিত হয়। ঠিক চার বছর পরে মার্চ-এপ্রিল 1988 সংখ্যাতে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে আর্সেনিক দূষণের ওপর একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়।

আর্সেনিক শরীরে গেলে চামড়া বা ফুসফুসে ক্যান্সার হবার আশঙ্কা। প্রাণঘাতী মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় দীর্ঘদিনের বিষক্রিয়ায় ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, আন্ত্রিক ও পাকস্থলীর রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। আর্সেনিক দূষণের প্রধান উৎস হলো কীটনাশক।

সীসা॥ গড়ে আমরা প্রত্যেকে দৈনিক 0·3 মিলিগ্রাম সীসা জলের মাধ্যমে এবং 0·1 মিলিগ্রাম সীসা প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি। দৈনিক 2 মিলিগ্রাম সীসা গ্রহণের ফলে কিডনি ও ধমনীগুলির এমন পরিবর্তন ঘটে যা আয়ু কমিয়ে দেয়। মানব শরীরে সীসা জমতে থাকে, বের হয়ে যায়না। এর বিষক্রিয়ার প্রাথমিক উপসর্গ অনিদ্রা, গা-বমিভাব, রক্তাল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অবসাদ ইত্যাদি। দুধকে সীসা-বিষের প্রতিষেধক বলে ধরা হয়।

অ্যালুমিনিয়াম॥ উত্তর ভারতে মিষ্টান্নকে রূপোর তবকে মুড়ে দেবার রেওয়াজ ছিলো। এখন রূপোর বদলে প্রচলন হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের যা অবাঞ্ছিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভা-

বিক কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এসব ছাড়াও নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টার ও অন্যান্য সূত্র থেকে তেজস্ক্রিয়তা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়ে দূষণ ঘটতে পারে।

জীবাণুঘটিত দূষণ (Bacterial and Fungal Contamination)

দই খেয়ে বহুলোকের একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা মাঝে মাঝে অনেকেই শুনে থাকবেন। জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়ার ফলেই এমন ঘটনা ঘটে। খাদ্য প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়েই জীবাণুঘটিত দূষণ ঘটতে পারে।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে চাষ, ঝাড়াই-বাছাই, সংরক্ষণ, পরিবহন, বণ্টন ইত্যাদি যে কোনো পর্যায়ের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির ফলে খাদ্যে দূষণের, বিশেষত জীবাণুঘটিত দূষণের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়। এ ধরনের দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে দুরকম উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে—(ক) স্নায়বিক ও পক্ষাঘাত জাতীয় রোগ এবং (খ) আন্ত্রিক গোলযোগ।

আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, অক্সিজেন ইত্যাদি পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের সামান্য মাত্র হেরফেরে জীবাণুদের ভারসাম্যে (microbiological balance) তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। প্রতিটি জীবাণুরই বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা তিন রকমের—ন্যূনতম (minimal), উর্দ্ধতম (maximal) এবং যথাযথ (optimal)। বেশির ভাগ ব্যাকটিরিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যথাযথ তাপমাত্রা হলো 20° থেকে 45° সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রা কমলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি সাধারণত কমে, কিন্তু জীবাণুরা ধ্বংস হয় না।

খাদ্যে জীবাণু ও ছত্রাকঘটিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ

কেনার সময়ে খাদ্যদ্রব্যে কোনো দূষণের চিহ্ন দেখা গেলে তা না নেওয়া উচিত; যেমন বাসি মাছ-মাংস, পচা ফল ইত্যাদি। ঘরে তৈরী খাদ্যদ্রব্যেও পচন বা দূষণের চিহ্ন সতর্ক থাকলে ধরা যায় এবং তা না খেয়ে ফেলে দেওয়াই ভালো, যাতে সংক্রমণ না ঘটে। জীবাণু বা ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রে কিছু চূর্ণ, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থকে বেশ কার্যকর হিসাবে দেখা গেলেও এখনো পর্যন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি।

চট্‌জলদি খাবারের (Fast Food) **দূষণ**

প্রচলিত ধারণা হলো আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংক্‌স্ ও হ্যামবার্গার ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য স্বাস্থ্যকর, বিশেষত শিশুদের পক্ষে। বাস্তবে এক সমীক্ষায় সানফ্রান্‌সিস্‌কোর শিশুদের মধ্যে এ ধরনের খাদ্য বেশি গ্রহণের ফলে চূড়ান্ত অস্থিরতা (hyper-activity) এবং শেখার ক্ষমতা হ্রাস (learning disorder) হবার লক্ষণ ধরা পড়েছে।

সম্প্রতি Fast Food বা চটজলদি খাবার ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর আগেও বিভিন্ন খাদ্যবস্তুকে টিন বা কাচের (সাধারণতঃ বায়ুরোধী) কৌটোয় পাত্রস্থ করে বাজারে পাঠানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন additive-এর ব্যবহার চলে আসছিলো। এদের মধ্যে কৃত্রিম স্বাদ গন্ধ ও রঙ ছাড়া রয়েছে Sweeteners, Preservatives, Emulsifying and Stabilising agents। যেহেতু যে কোনো রাসায়নিক বস্তুই বেশি ঘন অবস্থায় (in large concentrations) মানুষের শরীরের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য আপাত নির্দোষ additive গুলির ক্ষেত্রেও নিরাপদ মাত্রা (safe limit) নির্ধারণ করা খুবই জরুরী। Acceptable daily intake (ADI) ধরা হয় এমন একটি মাত্রাকে যা প্রতিদিন কেউ সারা জীবন ধরে গ্রহণ করলেও তা থেকে বিপদের ঝুঁকি থাকে নগণ্য। FAO/WHO যুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ হলো—অনুমোদিত additive ব্যবহার করা যেতে পারে ততটুকুই যে ন্যূনতম মাত্রা বাঞ্ছিত ফল পাবার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

যে সব additive কে এক সময় নির্দোষ ভাবা হতো পরবর্তীকালে গবেষণায় সেগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, অনেক additive-কে আদৌ কোনো পরীক্ষা না করে অথবা অনুপযুক্ত পরীক্ষা করে বাজারে 'নিরাপদ' বলে চালানো হচ্ছে। মানুষের বংশগতির ক্ষেত্রে, জিনের গঠনে এবং ভাবী সন্তানদের ওপরে এই সমস্ত additive-এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কোনো যথার্থ গবেষণাই হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জোরালো নজরদারি ব্যবস্থার প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগগুলির সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার ফলে তা প্রায় অনুপস্থিত।

উপসংহার

খাদ্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাহলে কোন্ মানদণ্ড ব্যবহৃত হবে? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—যিনি তা খেলেন তাঁর বা তাঁর সন্তানের যেন কোনো ধরনের অসুস্থতা বা শারীরিক অক্ষমতা না দেখা দেয়। খাদ্যের শুদ্ধতা ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে যথাযথ মান বজায় আছে কিনা বা তা স্বাস্থ্যকর কিনা—এ সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বা চিহ্ন সমস্ত খাদ্যের ক্ষেত্রে থাকার ব্যবস্থা দরকার। এ ব্যাপারে ক্রেতারা সজাগ হলে এবং এমন এক ব্যবস্থা দাবী করতে থাকলে তবেই সারা দেশে এটি চালু হ'তে পারে। শুধু শুদ্ধতা বা উৎকর্ষই নয়, খাদ্যের পুষ্টিগুণের ব্যাপারেও এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকা উচিত। খাদ্যের পুষ্টিগুণ, সুষম খাদ্য ও খাদ্য গ্রহণে সতর্কতা বিষয়ে সামগ্রিকভাবে অবহিত করবার জন্য পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমগুলিকে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। দিল্লীতে সম্প্রতি প্রতিটি বিক্রেতা ও ফিরিওলাকে লাইসেন্সের আওতায় আনা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা অন্য সব শহরের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত। যে সমস্ত সংস্থা ও গোষ্ঠী গণবিজ্ঞান আন্দোলন বা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত তাঁরা তাঁদের কর্মসূচীতে এ বিষয়টিকে যথাযথ স্থান দিলে এবং ক্রেতা আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করলে যথেষ্ট সুফলের সম্ভাবনা।

সূত্র : 1) Food Adulteration—Thankamme Jacob
2) Text book of Preventive and Social Medicine—Park & Park 3) Poisons in our food —Thankamme Jacob.

নিবন্ধটিতে এমন কয়েকটি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে যা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক আজ জরুরী। পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি—চিঠিপত্র আকারে অথবা পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ আকারে। সঃ মঃ, বি-ও-বি

এদেশে এইডস মহামারী হবে কি

পাচু রায়

দু'এ দু'এ চার-এর অঙ্ক সবসময়ে মেলে না। কারণ যোগ করার আগেই হারিয়ে যায় অনেক কিছু, আবার যুক্তও হয়। চারের বদলে অঙ্কের ফলাফলে আসে চক্রান্ত। এইডস নিয়ে সোরগোলের ব্যাপারটা অনেকে সরল সমীকরণে মেলানর চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে দু'এ দু'এ চার হলে এবং আমার অঙ্ক ভুল প্রমাণিত হলে অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মত এই আমিও খুশী হবে, আনন্দিত চিত্তে নিজের ভুল অকপটে মেনে নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, ডালমে বহুত কালা।

এদেশে এইডস মহামারী হতে পারে এমন আওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই তোলা হচ্ছে। বায়োজনিক্সের রিগ্যাল ইনজেকসন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনা 'মহামারীর' তত্ত্বকে টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠা দিল। কোথা থেকে এবং কিভাবে এইডস-এর এ্যান্টিবডি রিগাল ইনজেকসনে এল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এইডসের জন্য এলাইজা এবং ওয়েসটার্ন ব্লক টেস্ট প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল রক্ত সংগ্রহের সর্বক্ষেত্রে। [জামসেদপুরের দুর্ঘটনায় আহত এক মহিলা প্রয়োজনীয় রক্ত গ্রহণে অস্বীকার করেছে। কারণ এইডসের ভূত (অথবা ভবিষ্যৎ !)]

এইডস এদেশে মহামারী হতে পারে কিনা সে প্রশ্নে বিস্তারিত হওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোলের সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত তদানীন্তন অধিকর্তা ওয়ালটার ডাওডলের একটি বক্তব্য পেশ করি। তিনি বলেছিলেন, 'যৌনক্রিয়া পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে দেশ-ভেদে রোগ সংক্রমনের বিভিন্নতা ঘটবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা থাকবে এই রোগ সংক্রমণের ব্যাপারে' (**Word Health Forum 6 (4) 1985**)।

একথা সত্য যে পাশ্চাত্যে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে এইডস প্রায় মহামারী পর্যায়ে। মহামারী বা তার চেয়েও বীভৎস কিছু। কারণ মহামারীর আকার ও প্রকৃতি অনেকটাই খালি চোখে পরখ করা যায়। কিন্তু এইডস-এর ভাইরাস হিউম্যান ইমমিউনো ডেফিসিয়েন্সী ভাইরাস সংক্ষেপে HIV (যাকে আগে বলা হত হিউম্যান টি লিমফোট্রফিক রেট্রো-ভাইরাস সংক্ষেপে **H T L V III**) এমনই এক কালান্তক যে নিঃশব্দে শরীরের ভিতর ঘুমিয়ে থাকতে পারে 5 কিংবা 10 বছর। তারপর জেগে ওঠা মানেই শিয়রে সমন। (যদিও এ সম্পর্কেও অন্যরকম কিছু কথা আছে।) এখন সারা পৃথিবীতে 1 কোটি লোকের রক্তে এইডসের এ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে এবং এর প্রায় সবটাই পাশ্চাত্যে। একমাত্র 1988 সালেই মার্কিন মুলুকে 32 হাজার মানুষ এইডসের খতরা খাতায় নাম লিখিয়েছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে 'এইডস' মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ এক শব্দ। যদিও রক্তে এইডস এ্যান্টিবডি পাওয়া মানেই এইডস হওয়া নয়।

কিন্তু মার্কিন মুলুকে মহামারী হলে তা ভারত ভূমিতে দেখা দেবে এমন কথা অন্তত এইডসের ক্ষেত্রে খাটে না। যেমন ভারতবর্ষে কলেরা মহামারী হলে আমেরিকায় কলেরা হয় না বা আমাদের বাৎসরিক হেপাটাইটিস পূজার মতন পাশ্চাত্যে তা ঘটে না। কেন ঘটেনা ? কারণ ওইসব সংক্রামক ব্যাধি মহামারী হওয়ার মতন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো পাশ্চাত্যে নেই। 1988-র শেষের দিকে ইংলণ্ডে মুরগীর ডিমে কোথাও কোথাও সালমোনেলা পাওয়া গিয়েছিল। সালমোনেলা এসেছিল মুরগীর খাদ্য থেকে। মুরগীর এই খাদ্য দেশের যে কোনও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশংকায় ইংলণ্ডের যাবতীয় মুরগীর খাদ্য, মুরগী ও মুরগীর ডিম নষ্ট করে ফেলা হল। গ্যাস চেম্বারে মেরে ফেলা হল ইংলণ্ডের সমস্ত মুরগী। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওদেশের এথিকস এরকমই। এদেশে মুরগীর বদলে অপরাধী সাব্যস্ত হত আক্রান্ত ব্যক্তিরা। ভূপাল থেকে বেহালা আমাদের এমনতর বিশ্বাসই আনয়ন করেছে। এজাতীয় জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগে পাশ্চাত্যে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য বললেই চলে। আর ভারতসহ উন্নয়নশীল (!) দেশগুলোতে প্রতি বছর এক যক্ষ্মায় মারা যায় 30 লক্ষ মানুষ, নানান শিশুরোগে অকালে ঝরে পড়ে 50 লক্ষ শিশু। পয়ঃপ্রণালী ও জল সরবরাহের শোচনীয় দুরবস্থা, অপুষ্টি ও অশিক্ষা হল আমাদের দেশে নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির সূতিকাগৃহ।

মজার ব্যাপার হল এই সূতিকাগৃহে এইডস জন্মায় না। এইডস-এর সূতিকাগৃহ হল এমন সব সামাজিক পরিবেশ যেখানে মানুষ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য রকম। সমকামিতা যেখানে যৌনাচারের এক প্রতিষ্ঠিত এবং বহুজন অনুসৃত উপায়। এবং এই সমকামী যৌনাচার এইডস সংক্রমণের একমাত্র উপায় না হলেও অন্যতম উপায় তো বটেই।

কেন সমকামিতা এইডস্ সংক্রমণের অন্যতম কারণ ? এই প্রসঙ্গ আলোচনায় এইডস ভাইরাস সম্পর্কে অনেকের জানা কিছু বিষয় আবার উল্লেখ করা যাক। HIVকে বলা হয় রেট্রোভাইরাস। রেট্রোভাইরাসের সঙ্গে অন্য ভাইরাসের তফাৎ কোথায় ? জীবকোষকে যেসব ভাইরাস সাধারণত আক্রমণ করে (যেমন গুটিবসন্ত জলবসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি) তাদের কেন্দ্রীয় অনুটি অর্থাৎ বংশগতি অনুটি ডি. এন. এ। কিন্তু রেট্রোভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি আর. এন. এ। এখন আর. এন. এ যুক্ত ভাইরাস হলেই রেট্রোভাইরাস হয় না। সমস্ত প্লান্ট ভাইরাসের

কেন্দ্রে থাকে আর. এন. এ। এবং তারা এমন কোন কোষকে আক্রমণকরতে পারে না যার বংশগতি অনু ডি. এন. এ। কিন্তু রেট্রোভাইরাস পারে এবং তাই করে থাকে। কি উপায়ে করে? রেট্রোভাইরাস জীবকোষকে আক্রমণ করার পর রিভার্স ট্রানসক্রিপটেজ নামে একটি উৎসেচক তৈরী করে। এই উৎসেচক আর. এন. এ'র ডি. এন. এ প্রতিলিপি নির্মাণ করে। এবং এই উৎসেচকের সাহায্যেই জীবকোষকে বিধ্বস্ত করে রেট্রোভাইরাস। এখন যে কোনও ভাইরাসের ক্ষেত্রেই আক্রমণের টার্গেট নির্দিষ্ট। জীবদেহের সমস্ত কোষকে সাধারণত কোন একটি বিশেষ ভাইরাস টার্গেট করে না। যেমন র‍্যাবিস ভাইরাস আশ্রয় নেয় মস্তিষ্কের কোষে। ঠিক তেমনি HIV আক্রমণ করে মনুষ্যদেহে রোগ প্রতিরোধে অপরিহার্য T4 কোষকে। এবং কদাচিৎ মস্তিষ্কের কোষও HIV-র আক্রমণের লক্ষ্য হয়। T4 কোষকে আক্রমণের ফলে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এবং সেই কারণে রোগীর মৃত্যু হয় যে কোনও রোগে। এরকম কয়েকটি রোগ হল —নিউমোক্সিসটিস ক্যারাইনী (ফুসফুসের মারাত্মক ব্যাধি), ক্যাপোসিস সারকোমা, ক্যানডিডিয়াসিস, ক্রিপটোকক্কোসিস, হারপিস সিমপ্লেক্স (পায়ুতে আলসার), ক্রিপটোস্পোরিডিওসিস, টক্সোপ্লাসমসিস (মস্তিষ্ক ও ফুস-ফুসের মারাত্মক ব্যাধি) এবং ভাইরাস ও ছত্রাক ঘটিত যে কোনও রোগ।

এত আলোচনায়ও কিন্তু পরিষ্কার হল না এইডসের সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক কোথায়! এবং কেন ভারতের জনপদ এইডস সংক্রমণের সহায়ক ভুমি নয়! এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এইডস কি কি উপায়ে সংক্রামিত হতে পারে সে প্রশ্নের আলোচনায়। সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ আমাদের জানিয়েছে যে, রক্তের সরাসরি সংস্পর্শে না এলে এইডস সংক্রমণ ঘটে না। রক্ত ছাড়া HIV-র vehicle বা মাধ্যম হতে পারে বীর্য। রোগীর থুতু, মল, মূত্র, কফ ইত্যাদিতে উপস্থিত ভাইরাসের নগণ্য সংখ্যা কোনও অবস্থাতেই এইডস সংক্রমণ ঘটাতে পারে না। এ ব্যাপারেও HIV -এর এক অনন্য বিশেষত্ব রয়েছে। এইডস সংক্রমণের জন্য HIV-র অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায় প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক পরীক্ষায় দেখা গেছে হেপাটাইটিস-বি আক্রান্ত 1 সি সি রক্ত 1 লক্ষ 10 হাজার লিটার জলে মিশিয়ে সেই জল 1 সি সি কোনও সুস্থ শিম্পাঞ্জীকে ইনজেক্ট করলে তার হেপাটাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ। কিন্তু ঐ মাত্রায় লঘুকরণের পর HIV কোনও শরীরে অনুপ্রবেশ করলে এইডস-এর কোন সম্ভাবনাই নেই। এমন কি এইডস আক্রান্ত শরীর থেকে 1 সি সি রক্ত মাত্র 1 লিটার জলে মিশিয়ে সেই জলের 1 সিসি কোনও সুস্থ শরীরে ইনজেক্ট করলেও এইডস হবে না। সুতরাং রোগীর চোখের জল থেকে মল পর্যন্ত শরীর উদ্ভুত যাবতীয় পদার্থে উপস্থিত ভাইরাস কখনই বিপজ্জনক স্তরে পৌছায় না। একমাত্র বীর্যই ধারণ করতে পারে এইডস সংক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক HIV। সুতরাং রোগীর রক্তের এবং বীর্যের সংস্পর্শে না এলে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রোগীর সঙ্গে হাঁটা চলা, ওঠা-বসা, এমন কি রোগীর হাঁচি গায়ে লাগলেও এইডস হবে না। এবং যে বিপর্যস্ত জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নানাবিধ সংক্রামক রোগ এদেশে দাবানলের মতন ছড়িয়ে দেয় তা HIV সংক্রমণের আদৌ সহায়ক নয়।

এখনও পরিষ্কার হল না সমকামিতার প্রশ্ন। কিন্তু আমরা এবার এসে গেছি উত্তরের একেবারে কাছাকাছি। রোগীর রক্ত যদি সরাসরি সুস্থ শরীরে ঢোকে তবে এইডস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এটা হতে পারে ব্লাড ট্রানসফিউসনের সময় ও মেইন লাইন (ইন্ট্রাভেনাস) প্রক্রিয়ায় ড্রাগ সেবনের ফলে। কিন্তু এইডস ছড়িয়েছে এবং এখনও ছড়াচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমেই।

এই যৌনক্রিয়ায় এইডস সংক্রমণের ব্যাপারে পুরুষ অনেক বেশী বিপজ্জনক নারীর তুলনায়। বীর্য হল এইডস ভাইরাসের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বাহক। তবে এইডস সংক্রমণের জন্য এই বীর্যকে রক্তের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে হবে। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ প্রাচীরে রয়েছে স্কোয়ামাশ কোষের অসংখ্য স্তর। স্কোয়ামাশ কোষ ঘাতসহ এবং যৌনসংসর্গজনিত পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং যোনিপথে যদি কোন ক্ষত না থাকে বা রক্তস্রাবের সময় যদি যৌনসংসর্গ না ঘটে তবে সংসর্গকারীদের একজন এইডস রোগী হলেও অন্যজনে তা সংক্রামিত নাও হতে পারে। এবং না হওয়ার সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে প্রবল। পুরুষটি যদি এইডস আক্রান্ত হয় এবং মুখগহ্বরে ক্ষতযুক্ত কোনও পুরুষ বা নারী যদি পুরুষাঙ্গটি লেহন করে তবে শেষোক্তের এইডস্ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এবং এই লেহন প্রক্রিয়া হল সমকামিতার অন্যতম উপাচার। প্রায় সব মানুষেরই মুখগহ্বরে কিছু না কিছু ক্ষত থাকেই। অপরদিকে এইডস আক্রান্ত নারীর স্তনে বা যোনীতে যদি ক্ষত না থাকে বা লেহন-কারীর মুখগহ্বর যদি ক্ষতমুক্ত হয় তবে ঐ সব প্রত্যঙ্গ লেহনে পুরুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পায়ুপথে সংসর্গে (anal sex) এইডস হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ। পায়ুনালী কলমনার কোষের সমবায়ে নির্মিত। এই কোষ যোণীর স্কোয়ামাশ কোষের মতন যৌনসংসর্গঘটিত পীড়ন সহ্য করতে পারে না। এর ফলে যৌনসংসর্গের সময় পায়ুর কলমনার কোষ বিদীর্ণ হয়। এবং বীর্যস্থিত HIV সংসর্গের নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিটির রক্তে সরাসরি হাজির হয়। অপরদিকে পুরুষাঙ্গের অভ্যন্তরীণ কোষও যোনীর আভ্যন্তরীণ কোষের মতন ঘাতসহ নয়। ফলে anal sex ঘটিত পীড়নে পুরুষাঙ্গের আভ্যন্তরীণ কোষ বিদীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে সক্রিয় পুরুষটি নীরোগ হলেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি নিষ্ক্রিয় পুরুষটি রোগাক্রান্ত হয়। এই কারণেই সমকামী পুরুষদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সর্বাধিক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইওরোপের এইডস রোগীদের মধ্যে শতকরা 70 জন সমকামী পুরুষ।

এবং এ কারণেই সারা পৃথিবীতে যখন 1 কোটি এইডস রোগী, তখন পশ্চিমবঙ্গের 6 কোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র 4 জন এইডস রোগী, ভারতবর্ষের 80 কোটি জনসংখ্যার মাত্র 29 জন। পুরুষের সমকামিতা এখনও এদেশে তেমন আকছাড় দেখা যায় কি? কজন পুরুষ সমকামীর

দেখা মেলে আমাদের দীর্ঘ জীবনে? সুতরাং যে পথ ধরে পাশ্চাত্যে এইডস মহামারীর আকৃতি নেয় সে পথ এদেশে এখনও তেমন উন্মুক্ত নয়। ড্রাগ সেবনের ব্যাপারটা কিছু চালু হলেও মেইন লাইনে ড্রাগ নেয় কজন?

তবে এই 29 জন নিয়ে কেন এত হৈচৈ? অন্তঃসত্ত্বাকে যথাসময়ে টীকা না দেওয়ার কারণে ফি বছর এদেশে 2 লক্ষ 80 হাজার শিশু 1 মাস বয়সের আগেই কেবলমাত্র ধনুষ্টঙ্কার রোগেই মারা যায় (সূত্র: ন্যাশন্যাল ইনসটিট্যুট অফ কমিউনিকেবল ডিসিসেস, নতুন দিল্লী)। কতটা হৈচৈ হয় তার জন্য? তবে কেন 29 জনের এইডস নিয়ে এত সোরগোল? রিগাল ইনজেকসনজনিত ঘটনার পরবর্তী সোরগোলের কথা এক্ষেত্রে আমি বলছি না। কারণ সে সোরগোল অনিবার্য ছিল। সোরগোল না তুললেই অন্যায় করা হতো। কিন্তু রিগাল ইনজেকসনে এল কি করে এ্যান্টিবডি? কার মাথায় প্রথম খেলল এবং কেন খেলল রিগাল ইনজেকসনের এলাইজা টেস্টের কথা? হাইলী ইমিউনাইজড এবং পরিচিত দাতাদের কাছ থেকেই যখন এসব ক্ষেত্রে রক্ত সংগ্রহ করে কম্পানীগুলো তখন সেই সব ডোনারদের পরীক্ষা করতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের সময় আমাদের আরও গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থনীতির মেলবন্ধনের বিষয়টি অবগত হওয়া। 1988 সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার বাজেটের শতকরা 80 ভাগ ব্যয় করেছে এইডস গবেষণায়। সাহেবদের অসুখ এইডস গবেষণায় ব্যয় হয়েছে 24 কোটি ডলার। মার্কিন মুলুকে প্রতি বছর খরচ হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয়ভারের একটি অংশ তুলতে হবে না ভারতের 80 কোটি লোকের বাজার থেকে?

সরকারী আমলা ও জ্ঞানীগুণী মহাজনদের (!) খাইয়ে পাশ্চাত্যে বাতিল ড্রাগ যেখানে ডাম্প করা যায় তার নাম ভারতবর্ষ। বহুমুখী প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী সিগেলা ডিসেনটেরীয়া হঠাৎ কোথা থেকে এল এই ভারতভূমিতে? যার ফলে ঘটে গেল নালিডেকসিক এ্যাসিডের মতন একটি বিষের অবাধ বাণিজ্য। কারণ আন্ত্রিক তখন নিরাময় হচ্ছে কেবলমাত্র নালিডেকসিকেই।

সুতরাং এহেন ভারতবর্ষ থেকে এইডস গবেষণার ব্যয়ভারের একটি অংশ উসুল করতেই হবে। মাত্র 29 জন রোগী পাওয়া গেল তো কি হল? 'এইডস্ মহামারী হতে পারে' এই **shelling** এর আড়ালে নেমে যাক স্টেথিসকোপ কাঁধে, ফাইল হাতে বাদামী রঙের পদাতিক বাহিনী। সাহেব বেনিয়াদের হয়ে তারাই লড়ে যাবে জান প্রাণ দিয়ে। বিনিময়ে কিছুতো প্রাপ্তিযোগ আছেই—ডলার, বিদেশ ভ্রমণ—এইসব বা অন্য কিছু। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সোজা আঙ্গুলে কাজ না হলে বাঁকা আঙ্গুল ব্যবহার করা যেতে পারে। মধ্যযুগে বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত সামগ্রী শত্রু দেশের নাবিকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো অনুচরদের মাধ্যমে। কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও কে বলতে পারে সেই একই পদ্ধতি ভারতভূমিতে অনুসৃত হয়েছে কিনা! এই যুদ্ধ অবশ্য নিতান্তই বাণিজ্যিক কারণে। বাণিজ্যিক কারণ ব্যতিরেকে কোন্ যুদ্ধই বা ঘটে?

আমার এই সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হলে, দু'এ দু'এ চার-এর পাটীগণিত নির্ভুল হলে, সর্বাধিক প্রীত হবে এই অধম। তবে সত্যিকারের কোনও অনুসন্ধান এ ব্যাপারে আদৌ হবে কি?

[11 পৃঃ—এর শেষ অংশ]

বিশ্লেষণের জন্য: Panigrahi, K. C., *Archaeological Remains at Bhubaneswar*, Kitab Mahal, Cuttack, 2nd edn., 1981, পৃ 204-5 এবং পরবর্তী।

23. Panigrahi, উপরোল্লিখিত, পৃ. 205.
24. বর্তমান সারনাথের (বেনারসের কাছে) প্রাচীন নাম ছিলো—'ইসিপতন' (ঋষিপতন)। প্রচুর বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের সাথে ইসিপতনের নাম জড়ানো এবং অবশ্যই এগুলো অশোক-পূর্ববর্তী। তথ্য—Law, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 146. বলা হয়—এখানেই বুদ্ধ প্রথম ধর্মের চক্র প্রতিষ্ঠা করেছে।
25. Basham, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. 27 (এবং পাদটীকা)।
26. ইতিহাস পুনর্গঠন বা পুনরনুসন্ধানে দুর্লভ রচনা ও পুরাতাত্ত্বিক বস্তু ব্যবহার করা অপরিহার্য। আর এ দু'টি জিনিসই পণ্ডিত বা প্রতিষ্ঠান-আমলাদের কর্তৃত্ববাদের চরম গহ্বরে। ইতিহাসের তুলনায় এতো কম খনন হয়েছে। এমন কি কলিঙ্গনগরের অশোক-পূর্ব প্রাচীন দন্তপুর ইত্যাদির অবস্থান অজানা। কিন্তু স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়ে এগুলো করার বাধা অজস্র। পুরাবস্তু বা শিলালেখের ব্যাপারে কলকাতার যাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটি তো নিছক আমলাতন্ত্র।

মনের সমস্যা
আমরা কি কিছুই করতে পারি না

সুখময় ভট্টাচার্য

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে চিকিৎসা প্রযত্নও একটি ক্রয়যোগ্য পণ্য। আমাদের দেশের পক্ষেও এটি সত্য। যাঁদের প্রভূত অর্থ আছে, তাঁরা সবচেয়ে নামী দামী চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন, নামী দামী নার্সিং হোমে রোগার্তকে ভর্তি করতে পারেন, সংক্ষেপে বলতে গেলে।সবসেরা চিকিৎসা প্রযত্ন পেতে পারেন। কম অর্থবানেরা তা পারেন না। অনেক সময়ই চিকিৎসা প্রযত্নে এই বৈষম্য চিকিৎসার ফল অর্থাৎ আরোগ্যের ওপর অসম প্রভাব ফেলে।

ওপরের বক্তব্যটি কিন্তু আমাদের দেশে দৈহিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ্য। মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে ভারতে ধনী-দরিদ্রের একই হাল। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ভারতে মানসিক ব্যধির প্রকোপ দৈহিক ব্যাধির তুলনায় কম তো নয়ই, বরং বিভিন্ন প্রকার মনোরোগীর মোট সংখ্যা তাবৎ দৈহিক রোগার্তের সংখ্যার চেয়ে বেশীই হবে। দৈহিক ব্যাধির ক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক স্তরভেদে ব্যাধির প্রকোপে বৈষম্য আছে। কিছু দৈহিক ব্যাধি গরীবের জন্য বরাদ্দ, যেমন অপুষ্টি, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, পেটের অসুখ। ধনীদের বেশী হয় অন্য ধরনের ব্যাধি, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এগুলি প্রাচুর্যের ব্যাধি। মনোরোগ কিন্তু ধনী গরীব সকলের মধ্যেই সমান ব্যাপকতায় ঘটে এবং মনোরোগের চিকিৎসায় টাকা থাকা না থাকায় কোন ইতর বিশেষ হয় না। ধনীরা তাদের মনোরোগী আত্মীয়ের জন্য বেশী পয়সা খরচ করে নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেখানে রোগার্তকে আটকে রেখে ওষুধ খাওয়ানো হয়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ চিকিৎসা করা হয়। গরীব মানুষ রোগার্তকে নিয়ে ছোটেন বিনা খরচের সরকারী হাসপাতালে। সেখানেও আটক রেখে ওষুধ চিকিৎসা এবং বিদ্যুৎ চিকিৎসা।

দু-চার-ছ' মাস পরে আপাত লক্ষণ অর্থাৎ মারদাঙ্গা, আত্মহত্যা বা পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমলে (মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে টাকায় টান পড়লে) নার্সিং হোম থেকে রোগী বাড়ী ফেরে। কিছুদিন বাড়ীতে একক অলস জীবন কাটিয়ে, আত্মজনের অতি সতর্কতা বা ভুল ব্যবহারের শিকার হয়ে আবার ফেরে নার্সিং হোমে। সরকারী হাসপাতালে রোগার্ত বছরের পর বছর বন্দী থাকে। একবার ভর্তি করতে পারলে আত্মীয়স্বজন রোগার্তের অস্তিত্ব নির্দ্বিধায় ভুলে যান। ধনী গরীব কোন রোগার্তকেই স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে সমাজদেহে মিশে যাওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ভারতে সরকারী বেসরকারী কোন স্তরেই নেই। আমাদের সমাজও মনোরোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল তো নয়ই, বরং বিরূপ, অসহযোগী এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্মম। আমরা অন্ধজনকে হাত ধরে রাস্তা পেরোতে সহায়তা করি, কিন্তু মনোরোগীর অসংলগ্ন কথায় মজা পেয়ে তাকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলি!

ভারতে মনোরোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এবং অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে এক সামাজিক সাম্যাবস্থা বিরাজ করছে। ধনী পিতা তার মনোরোগী পুত্রকে নিয়ে যতটা অসহায়, গরীব পিতাও তেমনি উদ্বিগ্ন ও দিশাহারা তার মানসিক সমস্যাগ্রস্ত কন্যাটিকে নিয়ে। সরকারী বেসরকারী মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্নের কোন স্তরেই এমন ব্যবস্থা নেই যাতে মনোরোগীদের বিভিন্ন বৃত্তিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জনের পন্থা হতে পারে। তাদের কোন সবল মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয় না, যাতে তারা ভীত সংকুচিত না থেকে অবাধে মেলামেশা করতে পারে। পরিবার পরিজনকে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় না কিভাবে স্বাভাবিক ব্যবহার করে, পর্যাপ্ত বিবেচনা ও স্নেহ দিয়ে মনোরোগীকে স্বাভাবিক জীবন স্রোতে মেশাতে হবে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক সংগঠনগুলিতে মানসিক সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় না, যাতে করে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা সম্পর্কে বৃহত্তর সমাজে এক সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। আমরা অসুস্থ পরিচিতজনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটি, তাকে আশ্বাস দিই, সাধ্যমতো সহায়তা যোগাই। অর্থাৎ আমাদের এই সমাজই দৈহিক রোগার্ত ও প্রতিবন্ধীদের সহানুভূতির চোখে দেখে। তাহলে কোন মানসিক সমস্যাগ্রস্তকে কেন সেই আমরাই 'পাগল' বলে বিদ্রূপ করবো? কেন তার পরিবারের মানুষজন এক অহেতুক সংকোচে সমাজ দেহ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করবে? কেন আমরা একজন মাদকাসক্তকে সমস্যাগ্রস্ত না ভেবে অসামাজিক ব্যক্তি ভাববো? আমার সমাজের মানুষজন কিছু ক্ষেত্রে আর্তের প্রতি মমতার পরিচয় দেয়, অন্যক্ষেত্রে তারাই এত বিরূপ কেন? এর কারণ হচ্ছে, আমরা মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাত নই। আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের নির্মমতার কারণ।

প্রকৃত যে সত্যটি আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে তা হলো এই যে কিছু অসুখ বাদ দিলে অধিকাংশ মানসিক ব্যাধিই অসুস্থ পারিবারিক তথা সামাজিক পরিবেশের ফল। এবং সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পেলে বেশীর ভাগ মনোরোগেরই নিরাময় হয়। অল্প যে কিছু ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় না, সেখানেও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসায় আর্তের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব।

এই পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসায় থাকবে—ওষুধ চিকিৎসা (ড্রাগ থেরাপি), মানস চিকিৎসা (সাইকো থেরাপি), কর্ম চিকিৎসা (ওয়ার্ক থেরাপি) এবং পুনর্বাসন (রিহাবিলিটেশান) এবং আত্মীয়জনকে পরামর্শ দান (কাউন্সেলিং)। বিদ্যুৎ চিকিৎসা বর্তমানে বিশেষ দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া দেওয়া ঠিক নয়। যেখানে বিদ্যুৎ চিকিৎসা দিতে হবে, সেখানে বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থার অগ্রিম প্রস্তুতি নিতে হয়। আমাদের দেশের মনোরোগ চিকিৎসা এখনও প্রধানত ওষুধ এবং যত্রতত্র কারণে অকারণে বিদ্যুৎ চিকিৎসার প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ। চিকিৎসার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলি এখানে অনুপস্থিত। কয়েক বছর ধরে কয়েকজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে ঘুরে, সময় সময় হাসপাতাল নার্সিং হোমে অন্তরীণ থেকে, কয়েক হাজার বটিকা গলাধঃকরণ করে এবং বেশ কিছুবার বৈদ্যুতিক শক খেয়ে রোগার্ত এক জবুথবু অস্তিত্বে পরিণত হয়, কারুর এবং নিজেরও সাতে-পাঁচে থাকে না।

এই বিশ শতকের শেষার্ধে রোগার্তকে রোগ মুক্তির পূর্ণাঙ্গ সুযোগ না দিয়েই তাকে আরোগ্যের অতীত বলে গণ্য করা হবে? কিংবা বর্তমান অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় যাদের আরোগ্য লাভ হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা কি সত্যই আরোগ্য লাভ করেছে? কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন, অনেক সরকারী বেসরকারী হাসপাতাল নার্সিং হোম আছে যেখানে মনোরোগের চিকিৎসা হয়। এ-গুলিতে মনোরোগীকে নিয়ে মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) নিয়মিত কঘণ্টা বসেন? এসব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগীর বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে? স্বাবলম্বী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে রোগার্তকে সহায়তা করাকে চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আদৌ মনে করা হয়? এই বিশাল শহরে (পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রর কথা বাদই থাক) মনোরোগীর জন্য কটি ডে-কেয়ার সেণ্টার আছে, কটি হাফওয়ে হোম আছে? আদপেই আছে কি?

নেই যে তা বলাই বাহুল্য। এবং দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, এসব যে থাকা উচিত, নইলে মনোরোগের চিকিৎসা যে অসম্পূর্ণ থাকে, একথা আমরা জানিই না। এমন কি ভুক্তভোগী অর্থাৎ মনোরোগীর আত্মীয় পরিজনও এ তথ্য জানে না। মনোরোগ চিকিৎসার বর্তমান ধ্যানধারণা এবং রীতিপ্রকরণ যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে, তার অনেক কিছুই যে আমাদের দেশে অলভ্য, এ কথা আমাদের অজ্ঞাতই থাকছে। পরম প্রত্যাশায় একের পর এক মানসিক রোগবিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো বছরের পর বছর কেবল ওষুধ খাইয়ে অবশেষে চরম হতাশায় মনোরোগ সারে না এই উপলব্ধিতে আত্মজন রোগার্তকে কোথাও ভর্তি করে দিয়ে তার অস্তিত্ব বিস্মৃত হন অথবা বাড়ীতেই সে এক চির অশান্তির ও উদ্বেগের কারণ হয়ে বিরাজ করে।

কলকাতায় এখন দৈহিক রোগ নিরাময়ের চমকপ্রদ অত্যাধুনিক পরীক্ষা ও নিরাময়ের কেন্দ্র স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। অথচ একটি ডে-কেয়ার সেণ্টার বা একটি 'রেমেডিয়াল' স্কুল বা হাফওয়ে হোম এ শহরে নেই। নেই কেন এ বিষয়ে একজন প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে (তাঁর একটি নার্সিং হোমও আছে) জিজ্ঞেস করায় তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ, চেম্বারে রোগী দেখেই তাঁদের নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত হয় না, এসব বাড়তি উদ্যোগ নেবেন কখন। অকপট উক্তি, কিন্তু বিবেকবান উক্তি নয়। অতএব যাদের মাথাব্যথা, নিরাময়ের উদ্যোগ তাদেরই নিতে হবে। এবং এই উদ্যোগে অর্থাৎ একটি ডে-কেয়ার সেণ্টার বা হাফওয়ে হোম স্থাপন করতে বিশাল বিনিয়োগ লাগে না, বড় ডিগ্রীধারী বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না, বিশাল অট্টালিকা দামী যন্ত্রপাতি দুষ্প্রাপ্য ওষুধেরও দরকার হয় না। যা দরকার হয় তা হলো কিছু সমাজসচেতন মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এবং বৃহত্তর সমাজের কিছু সহায়তা।

একটি প্রকল্প

আমাদের সংস্থা "নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" সম্প্রতি সমাজের এই অবজ্ঞাত ও অবহেলিত দিক সম্পর্কে কিছু কর্মপন্থা হাতে নিয়েছে। কিশোর মনোরোগীদের জন্য কলকাতায় একটি ডে-কেয়ার সেণ্টার এবং গ্রামীণ পরিবেশে একটি আবাসিক হোম গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। আমাদের ধারণা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলে, কিছু করার প্রকল্প নিলে, একটা বড় সামাজিক প্রয়োজন পূরণের দিকে এক বড় পদক্ষেপ হবে। প্রয়োজন যে মাত্রার তাতে এ ধরনের প্রচেষ্টা আর্থিক স্বয়ম্ভরতা পাবে এবং অল্প হলেও কিছু জীবিকার সংস্থান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি এককভাবে বা দু-চারটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মানসিক স্বাস্থ্য প্রযত্নে যে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে, এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে আমরা সচেষ্ট। পাশাপাশি, যে সমাজে মনোরোগীকে পুনর্বাসিত করা চিকিৎসার অন্তিম লক্ষ্য, মনোরোগ সম্পর্কে তার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে আমরা কিছু প্রকাশনায়ও হাত দিয়েছি। "মানসিক ব্যাধি" নামে একটি পুস্তিকা ও কিছু লিফলেট আমরা প্রকাশ করেছি, ভবিষ্যতে আরও করবো। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও স্তরে মনোরোগ সম্পর্কে আলোচনাচক্র সেমিনার ইত্যাদি করাও আমাদের কর্মসূচীতে আছে। কোন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন এ বিষয়ে যৌথ কার্যক্রমে আগ্রহী হলে আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাবো। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা: (1) সোম থেকে শুক্রবার 12টা—5টা: ইউনিভারসিটি কলেজ অফ মেডিসিন, 244 বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলি-700020। এবং (2) সোম ও বুধ 6—8টা এবং শনিবার 4—8টা: "জনস্বাস্থ্য", 157সি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলি-700006 (খান্না সিনেমা বিল্ডিং)। □

জনবিজ্ঞান কংগ্রেস 1989

গত 15-18ই মার্চ দ্বিতীয় জনবিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল কলকাতার লবণ হ্রদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগে ভারপ্রাপ্ত সংগঠন হ'ল অধুনা গড়ে ওঠা (1986) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

এই জনবিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান মঞ্চের লিফলেটে যা বলা হয়েছে তা হ'ল "গত একবছরে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করব আমরা, চুলচেরা বিচার করব আমাদের চিন্তার। শানিয়ে নেব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। চিহ্নিত হবে শত্রু মিত্র। ঠিক করব বিজ্ঞানচর্চাকে জনমুখী করবার, তাকে বিজ্ঞানচিন্তায় রূপান্তরিত করবার সংগঠিত দাবী ও তার পরিপূরক কর্মসূচী তারপরে আবার কাজ।"

ঐ একই লিফলেটে জনবিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : "স্বাধীনতার পর চল্লিশটা বছর কাটলো। দেশের অগুণতি বিশ্ববিদ্যালয় আর গবেষণাগার আজ হাজারে হাজারে বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদ্ বানিয়ে চলেছে বিপুল উদ্যমে। এরা সব দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কতটা কাজে আসছেন তা নিয়ে সংশয় আজ দানা বাঁধছে অনেকেরই মনে। বিস্তর অর্থব্যয় করে প্রতিবছর বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স বসছে শ'য়ে শ'য়ে। গবেষকদের বিদেশ যাবার এখন ঢালাও ব্যবস্থা। অথচ সাধারণ মানুষ যাদের রক্ত ঘামের নির্যাসেই দেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণার এমন রমরমা, তাঁদের আর বিজ্ঞানীদের মাঝে দুস্তর ফারাক, বস্তুগত ও মানসিক উভয় অস্তিত্বেই। বলতে গেলে আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের ফলগুলি আজ ভোগ করছেন শাসক শ্রেণীর পোষ্য মুষ্টিমেয় মানুষজন। সবচেয়ে বড় আশংকার কারণ এই যে, এই প্রবণতা দ্রুত বর্ধমান।

"অন্যদিকে অশিক্ষা আর দারিদ্র্য দেশের মানুষের বৃহত্তর অংশকে রেখেছে অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রান্ত লোকাচার আর কুসংস্কারের বেড়াজালে। একমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতাই পারে ঐ বেড়াজাল কেটে যুক্তি আর সত্যের আলোর সন্ধান দিতে। আনন্দের কথা, গত কয়েক বছর থেকেই দেশের বেশকিছু বিজ্ঞান সংগঠন বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছেন।"

এই জনবিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোগে আরো একষট্টিটি সংগঠন অংশ-গ্রহণকারী রূপে চিহ্নিত। পরে কয়েকটি নূতন সংগঠনও কংগ্রেসে অংশ-গ্রহণ করে। এই কংগ্রেসের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো পাঁচটি সংগঠনে প্রস্তাব হিসাবে প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। বিষয় ও সংগঠন-গুলো যথাক্রমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসার, প্রস্তাবক পলিচেরী সায়েন্স ফোরাম ; শিক্ষা ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনের ভূমিকা, একলব্য, মধ্যপ্রদেশ ; স্বাস্থ্য, দিল্লী সায়েন্স ফোরাম ; পরিবেশ, কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ ; স্ব-নির্ভরতা ও বিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার হয়েছে শিশিরমঞ্চে 12 থেকে 16 মার্চ প্রত্যহ। বিষয়গুলো যথাক্রমে (1) বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্মীয় মৌলবাদ (2) বিশ্বশান্তি ও বিজ্ঞান (3) বিজ্ঞান পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য (4) কম্পিউটার ও সমাজ (5) বিজ্ঞান ও জাতীয় পরিকল্পনা (6) বিজ্ঞান ও স্বনির্ভরতা (7) বিজ্ঞান শিক্ষা (8) বিজ্ঞান প্রকরণ। প্রতিটি মূল আলেচ্য বিষয়ের উপর টাইপ করা পুস্তিকা তৈরী হয়েছে, আলোচনার নির্যাস ও পরবর্তী কর্মসূচীর রূপরেখাও ছাপান হয়েছে।

কংগ্রেসে ভূপাল ঘটনা, সামগ্রিক পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বনভূমি জলভূমি সংরক্ষণ ও উদ্ধারে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। ভূপালের ঘটনায় কারবাইডকে সর্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার কথাও আলোচিত হয়েছে। তবে দোষী ব্যক্তির সাজা হবে কিভাবে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি।

পরিবেশ দূষণে কল-কারখানা, বনভূমি উজার করার ঘটনা, জল বাতাস দূষণ, মোটর গাড়ীর জ্বালানি তেল, কীটনাশককে দায়ী করা হলেও একটা কথাও নেই পারমাণবিক চুল্লির ব্যাপারে কংগ্রেস কি সিদ্ধান্ত নিল সে সম্পর্কে। কীটনাশক ও অধিক ফলনশীল ফসল একে অপরের পরিপূরক। সেই অধিক ফলনশীল ফসল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মানসিকতা কি হওয়া উচিত, দেশীয় জিন কিভাবে সংরক্ষিত হবে, সে সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। বর্তমান চাষ পদ্ধতিই বা কতটা বৈজ্ঞানিক সেসব আলোচনাও একেবারেই অনুপস্থিত। জলাভূমি উদ্ধারের কথা বলা হলেও বর্তমান মৎস্যজীবীদের দুর্গতির কারণগুলো কিভাবে দূরীভূত হবে তাও কোনভাবেই বিশ্লেষিত হয় নি।

বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে বের করা স্যুভিনিয়েরে লেখকদের অনেকেই ধরেই নিয়েছেন বর্তমান কারিগরী বিদ্যাই বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরী করতেও সক্ষম। এ সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় না কি।

"মানুষের দারিদ্র্য বিজ্ঞানমুখী হওয়ার পথে প্রধান বাধা, বর্তমান চালু বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরী করতে পারে" "নূতন নূতন শিক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরী করতে পারে" "জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সজাগ করা, বা ঐ চাহিদা পূরণে বিজ্ঞানীদের চালিত করার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে" ইত্যাদি কথা দিয়ে পাতা ভরা হলেও কোন লেখকই কিভাবে এসব করা সম্ভব তার নির্দেশ দেন নি।

সরকারী বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানীদের কংগ্রেস যখন প্রথম শুরু হয় তখনও ছিল অনেক আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি, সমাজের স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের অনেক পরিকল্পনা। আজ তা পরিণত হয়েছে এক ক্লান্তিকর প্রহসনে।

এবারে পাশাপাশি চালু হয়েছে আর এক প্রচেষ্টা যার নামের আগে 'জনবিজ্ঞান' কথাটা যুক্ত। শুধু এই কথাটির উপস্থিতি কিন্তু কোনো যাদু সৃষ্টি করতে পারবে না। তার জন্যে চাই আলাদা প্রয়াস। □

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি আকর্ষণীয় আলোচনাচক্র

বিষয় : 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার'

সাধারণ মানুষ আর কতকাল বৈজ্ঞানিকদের দেবতার আসনে বসিয়ে রাখবে?—এই প্রশ্ন দিয়ে গত 30শে এপ্রিল Nuclear Power and its Acceptibility—শীর্ষক কনভেনশনের শুরু করলেন আহ্বায়ক ডাঃ সুজিত কুমার দাস।

পঞ্চাশের দশক ছিল নিউক্লিয় প্রযুক্তির জনপ্রিয়করণের দশক। তখন এই উদ্যোগে সামিল ছিলেন অনেকেই।—বিশেষ করে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌গণ।—জানালেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। তবে অনেকেই তখন এর ভয়ঙ্করতার স্বরূপ জানতেন না।—ক্রমে জেনেছেন। সেইমত অনেক দেশ তাদের কর্মসূচী বদলে নিচ্ছেন। উদাহরণ—সুইডেন। শ্রী অশোক মিত্র তাঁর ভাষণে নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা জানালেন। —নিউক্লিয় প্রকল্পে কিভাবে অর্থ ব্যয় হয় আমাদের দেশে। কিভাবে হিসাব দাখিলের দায় থেকে মুক্ত রাখা হয় সেই ব্যয়। তিনি জানালেন—পশ্চিমবঙ্গে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসবে এমন কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। তাঁর ধারণা রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা জানেন না সত্যিই কি ঘটতে চলেছে

প্রারম্ভিক আলোচনা পর্বের পর ছিল টেকনিকাল সেশন। এই পর্বে কয়েকজন বললেন—শক্তি সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিউক্লিয় শক্তির ব্যবহার আজ অপরিহার্য। যুক্তি হিসেবে ভারতের মত দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার কথা উল্লেখ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন Nuclear Regulatory Board-এর চেয়ারম্যান ডঃ এ. কে. দে।—ছিলেন Nuclear Reactor Safety বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ রাধা কৃষ্ণান। কলকাতার VECC প্রকল্পের ডিরেক্টর ডঃ বিকাশ সিংহ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ বিপদ মাত্রার নীচে বেঁধে রাখা সম্ভব বলে তাঁরা জানালেন। তাঁদের ধারণা এ নিয়ে অযথাই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। দুর্ঘটনা বা দূষণের ভয় যে কোন শিল্প-কারখানাতেই রয়েছে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর থেকে বিপদ এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। তাঁদের বিশ্বাস আগামী দিনে এই প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে গড়ে তোলা অসম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন এমন কয়েকজন বক্তা ছিলেন। যেমন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধীরেন্দ্র শর্মা, গুজরাটের অনুমুক্তি পত্রিকার সম্পাদক ডঃ সুরেন্দ্র গাড়েকার, উৎস মানুষ পত্রিকার ডাঃ স্মরজিৎ জানা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজয় কুমার বসু।

এঁরা সকলেই 'শক্তি' সমস্যার কথা স্বীকার করলেন।—মানলেন না 'শক্তি' সমস্যার সমাধান হিসেবে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট'-এর যুক্তি। দেশের মোট 'শক্তি'-চাহিদার কথা ছেড়ে দিয়ে, মোট 'বিদ্যুৎ চাহিদা'র অতি সামান্য অংশই মেটাতে সক্ষম এই রিয়াক্টর-জাত তাপ-বিদ্যুৎ। অথচ এই সামান্য অংশ বিদ্যুৎ—যা প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুতের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়েই মেটানো যায়, তার জন্য মানবজাতির অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক এই প্রযুক্তি ব্যবহার অসঙ্গত। এতে খরচ অনেক বেশী।—বেশী বিপদের ঝুঁকিও। আর সে বিপদ সাধারণ নয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জনিত বিপদ। যে ঝুঁকি বইতে হবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মীদের। বিপদ বয়ে বেড়াতে হবে বংশানুক্রমে।—আর দুর্ঘটনা ঘটলে কি হতে পারে উদাহরণ—চের্নোবিল।

এঁদের মতে—আসলে এই প্রযুক্তির সমর্থনে বলছেন যে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, প্রশাসক তাঁরা বিশেষ এক স্বার্থকেই মদত দিচ্ছেন। জেনে বুঝেও প্রকৃত তথ্য গোপন করছেন অথবা বিকৃত করছেন। রিয়্যাক্টর দুর্ঘটনাকে বিমান দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করছেন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদকে তুলনা করছেন সাধারণ শিল্পজাত দূষণের সাথে!

এই প্রযুক্তির পক্ষের লোকজনেরা বলছেন—বিকল্প কোথায়? বিদ্যুৎ তো প্রয়োজন। তার উত্তরে এনারা জানাচ্ছেন, বিকল্প অনুসন্ধানে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছেন কি কর্তৃপক্ষ? সম্ভবত—না। বিকল্প অনুসন্ধানের গবেষণায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ দেখলেই সেকথা বোঝা যায়। একজন তো সন্দেহ প্রকাশ করে জানালেন—আসলে বিদ্যুৎ নয়, সামরিক প্রয়োজনেই নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বসানোয় এতো আগ্রহ।

নিঃসন্দেহে বিষয়টি সবিশেষ টেকনিকাল এবং জটিল। সে কারণেই সিদ্ধান্তের ভার থাকে বিশেষজ্ঞদের উপর। যাঁদের সিদ্ধান্ত বা মতামত গড়ে ওঠে দেশের শাসক ও পুঁজি মালিকদের ইচ্ছায়। অথচ সাধারণ মানুষ যার ভাল-মন্দের ভাগী। এ ব্যবস্থাটা কেমন একপেশে। তাই ক্রমে বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠছে। তারই ফলশ্রুতি এমন কনভেনশন। বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর বক্তব্য হাজির হল একই মঞ্চ থেকে। বিষয়টি নিয়ে ভাবনার উদ্রেক করেছে অনেকের মনেই। টের পাওয়া গেল যখন মঞ্চে উঠে এসে জানিয়ে গেলেন সে কথা—শ্রোতাদের কয়েকজন। যেমন—প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট নাট্যমঞ্চ শিল্পী শ্রী তাপস সেন। বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা শ্রী বাদল সরকার।

দেশের কয়েক প্রান্তে আন্দোলন চলছে—এমন কয়েকটি এলাকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এই কনভেনশনে। তাঁরা একে একে তাঁদের আন্দোলনের কথা জানালেন। রীতিমত পুলিশী পীড়নের মধ্যে কাজ করছেন এঁরা। এদের মধ্যে ছিল দিল্লীর Network to Oust Nuclear Energy (NONE)। গুজরাটের 'অনুমুক্তি'। মন্দিরবাজার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। বালিয়াপাল ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বিরোধী আন্দোলনের লোকজন।

অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশন। বলতেই হবে—অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন উদ্যোক্তাদের পক্ষে জনকয়েক। আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ সুজিত কুমার দাস এবং শ্রীপ্রদীপ দত্ত।

প্রতিবেদক—অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে গবেষণাগারের ব্যাধি

দেবাশিস, নিখিলেশ

প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে 9.3.89 তারিখে 'নেচার'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির বক্তব্যের ভিত্তিতে। পত্রলেখক সি. এস. আই. আর-এর এক বিজ্ঞানকর্মী। অবশ্য 'নেচার' পত্রিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হয়নি। চিঠিটির উপর 'নেচার'-এর সম্পাদক মন্তব্য করেছেন: এরূপ কয়েকটি দুর্ঘটনার (নিপীড়িত বিজ্ঞানকর্মীর আত্মহনন) খবর তাঁকে ব্যথিত করেছে, তবে সব গবেষণাগুলিতে একই চিত্র তিনি বিশ্বাস করেন না।

সম্প্রতি এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর করুণ পরিণতির সংবাদে পৃথিবীর বিজ্ঞানীকুল স্তম্ভিত। তরুণ ঐ বিজ্ঞানী কাজ করতেন ভূপালের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে। এই গবেষণাগারটি সি. এস. আই. আর-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁকে এমন মানসিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হত যে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার হ'ল ঐ বিজ্ঞানীকে দৈহিক অত্যাচার থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হত না। ফলে যা হওয়ার তাই হল। বিজ্ঞানীটি অতীতের অনেকের মতন চরম পথটাই বেছে নিলেন। অর্থাৎ আত্মহত্যা করে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। (হিন্দুস্তান টাইমস্, 15 ই ডিসেম্বর 1988)।

সব উত্তেজনা সব আঘাতই যেমন আস্তে আস্তে সময়ের স্রোতে প্রশমিত হয়ে আসে—এ ঘটনাও হয়তো একদিন জনসাধারণের মন থেকে মুছে যাবে এবং বলাই বাহুল্য—দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান কিংবা দায়ী ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কোনটাই হবে না কোনদিন। ভারতের গবেষণাগারগুলির (বিশেষত CSIR নিয়ন্ত্রণাধীন) সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের গবেষণাগারগুলির তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে ভারত বর্ষের গবেষণার উপকরণ যথেষ্ট এবং সর্বাধুনিক হ'লেও মূল জায়গায় ভারতবর্ষের গবেষণাগারগুলো এক মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছে। জ্ঞানার্জন বা গবেষণার সুস্থ এবং খোলা পরিবেশ এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এবং এটা বিশেষত প্রযোজ্য CSIR নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারগুলোর ক্ষেত্রে। এখানে পরিচালকদের হাতে অগণতান্ত্রিক ভাবে (এ ব্যাপারটি বিজ্ঞান চর্চার সম্পূর্ণই পরিপন্থী) সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে বিজ্ঞান চর্চার সুষ্ঠ পরিকল্পনা, পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা করা, কিংবা গবেষকদের সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠ বণ্টন আদৌ সম্ভব হয় না। এই ক্ষমতা পরিচালকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারী মনোভাবসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অথচ এ ব্যাপারে অভিযোগ জানানোর মত তেমন কোন সক্রিয় সংগঠন বা কাঠামো আজও গবেষকরা গড়ে তুলতে পারেন নি।

পরিণতি একটাই—সমস্ত বিজ্ঞানীরা শেষে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনের ইচ্ছাই একসময়ে তাঁরও ইচ্ছেয় পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যাবতীয় দুর্নীতি এসে বাসা বাঁধে ভারতের গবেষণাগারগুলোতে।

অপেক্ষাকৃত সাধারণ মেধার (কিন্তু ডিরেক্টরের বশংবদ) বিজ্ঞানীরা (!) পুষ্ট হ'তে থাকেন,—সত্যিকারের উচ্চমেধার প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের অবহেলিত ও অপমানিত হতে হয় প্রতি পদে।

তবে দেশের সরকার কিন্তু চুপ করে থাকেন না। ভারতের আপামর জনসাধারণ ও বিজ্ঞানীকুলকে বোকা বানানোর জন্য মাঝে মাঝে একটা দুটো ক'রে আনুষ্ঠানিক কমিটি-কমিশন বসান তাঁরা এবং তাঁদের দেওয়া রিপোর্টগুলোও এক অজ্ঞাত হাতের খেলায় ফাইল-বন্দী হয়ে সরকারের আলমারীতে শোভা পায়। সাম্প্রতিক কালের আবিদ হোসেন কমিটির (আবিদ হোসেন নিজে কিন্তু কোনও কালে বিজ্ঞানী ছিলেন না) রায় তো আরও হাস্যকর—তিনি বলেছেন পরিচালকদের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে। মজা হ'ল পরিচালকরা নিজেরাই বলেছেন আরও ক্ষমতার তাঁদের কোন দরকার নেই, এখনই তাঁরা যথেষ্ট ক্ষমতাবান। তাঁদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের খবর কদাচিৎ অবশ্য সংবাদপত্রে আসে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যবস্থা সংবাদপত্রের কণ্ঠোরোধ করে। কিছু সাহসী সৎ এবং প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদে সাময়িক কিছু কিছু ফল হয় বটে, তবে তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। ফলে চিত্রটা কিন্তু একই রয়ে যায়। তাই ভারতের সি এস আই আর-এর গবেষণাগারগুলোর প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীরা অপমান এবং হয়রানির হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনটি রাস্তার যে কোন একটা বেছে নিতে বাধ্য হন:

(1) সব কিছু জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করেও তাঁরা টিকে থাকেন, সমস্ত রকম উদ্ভাবনী শক্তিকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে;

(2) এখান থেকে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে (যাঁদের অর্থ ও ধরার-লোক আছে তাঁরাই অবশ্য);

(3) শেষ এবং চরম পথ অর্থাৎ আত্মাহুতি দিয়ে। এ ব্যবস্থা চলতেই থাকবে যতদিন না বিজ্ঞানী গবেষকরা এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে পারছেন, জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলছেন। □

গ্রন্থ পরিচিতি

রঞ্জন কর্মকার : ঘূর্ণিঝড়ের রাজনীতি (আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ)।
গণ-উন্নয়ণ গ্রন্থাগার, ঢাকা, 1986, পৃষ্ঠা সংখ্যা 124, মূল্য ঃ 20 টাকা (বাংলাদেশ)।

বইটা হাতে এসেছিলো বেশ কিছুদিন আগেই। সুন্দর আর অর্থবহ এক সহজিয়া প্রচ্ছদ এর বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ চরিত্রটা অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছে বইটার বিষয়বস্তুর অত্যন্ত জরুরী আবেদনের ওপর। '86-তে বইটা বেরিয়েছে। তারপরেও সেই নির্মম ঘূর্ণিঝড় আর বন্যা বয়ে গেছে বারবার বছরে বছরে কিশোরী এই দেশটার ওপর দিয়ে। বইটা পড়তে পড়তে চলে গিয়েছিলাম খুব ছোটবেলাকার রাজশাহীর পদ্মা পাড়ে—ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সন্ধ্যা রাতে সরকারী ঘোষক পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে যাচ্ছে—ভীষণ ঝড় আসছে, আসছে সর্বনাশা বন্যা—সাবধান সাবধান। তারপর বহু বহু বছর উৎরে এসেও ঝড় বন্যা আজও দুর্দম—দুটো বাংলাতেই। শোনা যাচ্ছে এবং লেখক শ্রী কর্মকারও সেটি উল্লেখ করেছেন যে এ ঝড় ক্রমশই বাড়তে থাকবে, বইতে থাকবে প্রচণ্ড ভাবে দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে।

ঝড় বন্যা প্রাকৃতিক অনিবার্যতা। কখনো অবশ্য অনিবার্যতার দাপট ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে প্রকৃতির ওপর মানুষের—কিছু নেতা গোছের মানুষের—হস্তক্ষেপের ফলে। পরিবেশ ভারসাম্য হারায়। সব রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্য বাড়তেই থাকে। তাছাড়া, প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেও নিরন্তর পরিবর্তিত হতেই থাকে—যদিও অতি ধীরে—দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে। কারণ যাইই হোক, ঝড় বন্যার অনিবার্যতা মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু মেনে নিতে পারা যায় না ঝড় বন্যায় বয়ে আনা মানবিক ক্ষয়ক্ষতি। —এই যে "মেনে নিতে পারা যায় না"—এখান থেকেই—এই বোধ থেকেই শ্রী কর্মকার শুরু করেছেন, "ঘূর্ণিঝড়ের রাজনীতি" লিখতে। এবং দ্বর্থহীনভাবে স্বীকার্য, এ কাজটা অতি-প্রয়োজনীয় কাজ—বিশেষত বাংলা ভাষায় এমন একখানা প্রকাশনার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল—অবশ্যই বহু আগে থেকেই।

প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যপুষ্ট প্রবন্ধপুস্তক এটি নয়। তাই, বাঁচা গেছে—কারণ, বহু প্রয়োজনীয় এবং অতি সহজবোধ্য ও প্রতিষ্ঠিত তথ্য সমৃদ্ধ এই বইটির বয়ান ও আবেদন এমন যে তা অসংখ্য সাধারণ সাক্ষর মানুষ সহজেই গ্রহণ করতে পারবে এবং তা পারবে বলেই এই অগণিত সাধারণ মানুষ ঝড়-বন্যায় বয়ে আনা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে আসলে কেন অ্যাতো বিপর্যয়। এবং এই বইটিতে যে সত্যটিকে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে তা কিন্তু সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার উপকূল অঞ্চল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সেখানকার বঙ্গভাষী মানুষ—সাধারণ মানুষকেও শ্রী কর্মকার কতগুলি সরল প্রশ্ন তুলে ধরতে সাহায্য করছেন। অত্যন্ত সঠিক ও প্রাঞ্জল প্রশ্নটি তিনি প্রাক্ "কথন"এ রাখছেন : "বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা শাখায় যখন বিস্ময়কর সাফল্য ঘটছে তখন আমাদের দেশের উপকূলবাসী মানুষকে কেন প্রতি বছর প্রকৃতির নিষ্ঠুর ছোবলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, মৃত্যুবরণ করতে হয় ? প্রকৃতিকে কি জয় করা যায় না ?"

এই প্রশ্নটির জবাব সদর্থক অবশ্যই। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। কেন যে ঘটে না সেটা দেখানোর জন্যই বইটির রচনা। "ঘূর্ণিঝড়ের পিছনেও বিভিন্ন মহলের রাজনীতির খেলা চলায় সেটা হয় না"—এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যই গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারের এই প্রকাশনা। এটি শুরু হয়েছে প্রথম খণ্ডে নোয়াখালি জেলার চর-অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও তথ্যের আলোচনা দিয়ে। অবশ্যই বিস্তৃত নয়। 1985 সালের 24 মে তারিখে মাঝরাত্রে যে ঘূর্ণিঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে তা এই অঞ্চলের মানুষকে কী বিপর্যয়ে এনে ফেলেছিলো এবং সে বিপর্যয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ক্ষমতাবান অর্থপ্রেমিক অল্প কিছু মানুষ যে কতখানি দায়ী তা আলোচনা করতে গেলে চর অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও ইতিহাস জানা দরকার। এই আলোচনায় লেখক প্রধানত হাতিয়া, সন্দীপ ও উড়িরচরের বর্ণনা দিয়েছেন। কী ভাবে এই হাতিয়া, সন্দীপ বা উড়ির চর গড়ে উঠেছে, কীভাবে এই চরগুলি একদিকে নদীভাংগা হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় আর কী ভাবে আর একদিকে নূতন চর গজিয়ে ওঠে—এ সবই আলোচনা এতে আছে। চর তোরাবআলী, চর বৈশাখী, চর গাংচিল, চর ধানের-শীষ ; চর নবগ্রাম—এবং আরও কত চর অধ্যুষিত হয়ে আছে আসলে অসংখ্য দরিদ্র নিঃস্ব মানুষে। এই মানুষগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য দারিদ্র্য এবং সেইজন্যই সম্ভব অর্থপ্রেমিক জোতদারদের পক্ষে নিরঙ্কুশ দাপটে এই মানুষগুলোকে দিয়ে চরগুলিকে ফসলে ফসলে ভরে তোলা। আর নিছক বাঁচার তাগিদে যখন মূল ভূখণ্ডের অন্য কোথাও ঠাঁই হয় না তখনই এই হাজার হাজার ভূমিহীন বিত্তহীন মানুষ বাসা বাঁধে এই চরগুলিতে। তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক তাই লেখককে তুলে ধরতে হয়—দেখাতে হয় তাদের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, জমি মালিকানার ধরণ ধারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী সমাজ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী, যেমন জেলে সম্প্রদায়—ইত্যাদি। বিভিন্ন সারণীর সাহায্যে লেখক আলোচনাকে প্রাঞ্জল করেছেন (পৃঃ 20, 27, 34, 38, 41 ইত্যাদি)। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকৃতি ও পবিবেশ নিয়ে লেখক যখন ভাবতে বসেন তখন তাঁর আলোচনায় এই উপলব্ধিই প্রবল হয়ে ওঠে যে—"শুধু প্রকৃতি নয়, শোষণের সমাজকাঠামো গুরুভার বোঝার মতো চেপে আছে তাদের উপর। চরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লোনা বাতাসের উত্তাল প্রবাহে যেন হাহাকার করে উঠছে এই বঞ্চনা।"—লেখক সমস্ত বইটিতে শুধুমাত্র পরোক্ষ তথ্যসূত্র ব্যবহার করেন নি, তিনি নিজে সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্যও পরিবেশন করেছেন। তিনি দেখেছেন চর অঞ্চলের অর্থনীতির তথা সামাজিক পরিস্থিতির এক ভয়ঙ্কর কারণ হচ্ছে সেখানকার জমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা।

"আমাদের দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে হাজার হাজার একর সরকারী খাস জমি রয়েছে। সরকারী আইন রয়েছে খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়ার। কিন্তু উপকূলবর্তী অঞ্চলের খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে না গিয়ে কয়েকজন জোতদারের অধীনে চলে গেছে।" শোষণ ও বঞ্চনার এই পটভূমিতে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে, তখন অসংখ্য হতভাগ্য দরিদ্রদের আর যারাই রক্ষা করার কথা ভাবুক; তারা ঐ সব জোতদার এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রযন্ত্র যে নয় সেই আলোচনার সূত্রপাত দ্বিতীয় খণ্ড থেকে।

"অন্তহীন মৃত্যুর দেশ বাংলা দেশ।...অগণিত মানুষ মরে এখানে রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে, রাক্ষুসে ক্ষুধায়, রোগে মহামারীতে" (পৃঃ 65)। এত বিবিধ মৃত্যুর কারণের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রকৃতির তাণ্ডব এবং সেই তাণ্ডবের বিবরণ দিতে গিয়ে একটা অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন তিনি তুলেছেন: "পত্র পত্রিকার কল্যাণে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার থেকে লাফিয়ে লক্ষ পর্য্যন্ত উঠেছে।...তাহলে সরকারের অপ্রকাশ্য ইংগিতেই কি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে প্রচার করা হয়েছে? এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ক্ষমতাসীন সরকার কি কোন বিশেষ স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলেন?" (পৃঃ 66)। "মানুষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য কোন দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রচার, মানুষের মৃত্যু নিয়ে ব্যবসার সামিল" (পৃঃ 20)। লেখকের এই প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলি সুতীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ ইঙ্গিত বহন করে—যে ইঙ্গিতকে উলঙ্গ করে দিলে দেখা যাবে আধুনিক সমস্ত রকমের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে দারিদ্র্যকে যে ভাবেই হোক্ স্বদেশে-বিদেশে জিইয়ে রাখা—তাতে শাসন ও শোষণের সুবিধা হয় আবার ওগুলিকে সহজেই আড়ালও দেওয়া যায়—কারণ, দারিদ্র্য বিভিন্ন স্তরে স্তরে অন্বয় গড়ে তোলে ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষ-গৃহহীনতা-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্যের সঙ্গে। কোটি কোটি মানুষ ব্যতিব্যস্ত থাকে—প্রশ্ন করার অবকাশ নেই—প্রশ্ন করতে শেখে না—শুধু শেখে নির্ভর করতে এবং প্রবঞ্চকের আপাত দরদী চেহারাটার ওপর নির্ভর করতে। এই রকম এক নির্মম দুষ্টচক্রের শিকার বাংলাদেশের মানুষ—ঘূর্ণিঝড় নিপীড়িত মানুষ। যাদের ত্রাণ বা সাহায্য করতে রাষ্ট্র প্রশাসন, বিভিন্ন বাহিনী বিশেষত নৌবাহিনী এমন কি রেড ক্রস সোসাইটি পর্য্যন্ত অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে ও বস্তুতপক্ষে ব্যর্থ হয়েছে। রাডার সংকেত ব্যবস্থা একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলো সতর্কবার্তা পাঠানোর ব্যাপারে। জাপানী জি এম এস 3 উপগ্রহ যথাসময়ে ঝড়ের সংকেত বাংলাদেশে স্পারসোকে জানিয়ে দিলেও স্পারসো তদনুযায়ী ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, এমন কি স্পারসো তারিখের কারচুপি করে পত্র-পত্রিকাগুলিকে একদিন পরে খবর দেয় (পৃঃ 75, 76)। লেখক আলোচনায় দেখিয়েছেন কী বিপুল ঔদাসীন্য ও অদক্ষতা দেখিয়েছিলো বাংলাদেশ সরকার এবং এটাই ঘটে থাকে সর্বদা। তাই তিনি বারবার দাবি করেছেন সতর্কবার্তা পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সব সময় সচল রাখা ও সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন থাকাটা একান্ত দরকার। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার পর রেডক্রসের মাধ্যমে উপকূলবর্তী অঞ্চলের 24টি উপজেলার জন্য ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে। 1 হাজার 8 শত 13টি টিমে হাজার হাজার সদস্য ছিল। ছিল প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। অথচ, এই সমস্ত কিছুই কোন সাহায্যে আসেনি ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে। লেখকের মন্তব্য: "তাই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বলতে হয়, সরকারের উদাসীনতা ও লুটের রাজনীতির কারণেই স্বাধীনতার পর তৈরী ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটি, এখন অকেজো" (পৃঃ 82)। এই পর্যায়ের আলোচনায় শেষ পর্য্যন্ত লেখক প্রশ্ন তুলেছেন: এই যে হাজার হাজার মানুষ মরেছে, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? সমস্ত কিছু পর্যালোচনা ও প্রত্যক্ষ করার পর লেখক প্রশ্ন করেন—"...ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এই যে ব্যাপক প্রাণহানি, এটা কি শুধুই মৃত্যু, না গণহত্যা?" (পৃঃ 92)। তিনি যেন এক আশাদীপ্ত শপথ উচ্চারণ করলেন: "24 মে'র প্রলয় ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পথ দেখাবে বলে আমরা আশা করবো। মানুষের অসহায় করুণ মৃত্যু আর নয়" (পৃঃ 92)।

সর্বশেষ পর্যায় বা তৃতীয় খণ্ডে ত্রাণ নিয়ে আলোচনাটি ঘূর্ণিঝড় তথা রাজনীতির চিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলো। বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। অবশ্যই ভারতও ছিলো। সরকার ও সমস্ত রাজনৈতিক দলও নেমে পড়েছিলো ত্রাণে। এই ত্রাণ উদ্যোগগুলি আদৌ রাজনীতি-নিরপেক্ষ নয়। তবে সরকারী প্রশাসনের কড়া বিধিনিষেধে রাজনৈতিক দলগুলির ত্রাণকার্য ঠিকমতো চালানো সম্ভব হয় নি। স্বেচ্ছা-সেবী সংস্থা, যেমন: 'নিজেরা করি'; 'অক্সফাম', 'বাম', 'কারিতাস', 'কনসার্ন', 'আশা'—প্রচুর ত্রাণ সাহায্য করেছে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর ও বিলম্বিত ছিল—অথচ তাদের হাতেই সমস্ত রকম সুবিধা ও ক্ষমতা। সামগ্রিকভাবে এই অভিমত সকলেই পোষণ করতে বাধ্য হয়েছে যে যথাসময়ে দ্রুত ত্রাণসাহায্য এলে বহু সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি এড়ানো যেতো। আসলে যে মানুষগুলোর প্রাণহানি হয় এই রকম সব দুর্যোগ ও বিপর্য্যয়ে তাদের প্রাণের দাম কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছেই বা কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী দলের কাছেই তেমন কিছু নয়। তাই তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। এবং সর্বোপরি এই দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য তাদের "এ্যাসেট", মৃত্যু-ও "এ্যাসেট"। তাই যা হবার তাই হয়। লেখকও সেটা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছেন—কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দারিদ্র্য ও আধুনিক কায়েমী স্বার্থের আন্তর সম্পর্কটা ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিত খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ইত্যাদি গুলো যতই থাকে ততই চন্দ্রবিন্দুযুক্ত উচ্চাসীনদের পক্ষে মঙ্গলজনক—এই তথ্যটা আরও বলিষ্ঠভাবে বলতে পারলে ভালো হতো। তথাপি: চমৎকার বইটি। প্রচুর প্রয়োজনীয় সারনী (পৃ 68, 70, 90-91, 98-99) চিত্র ম্যাপ ও তথ্যনির্দেশ সংযোজনে লেখক সমস্ত সমস্যাটির একটা বস্তু নির্ভর বিবরণ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পেরেছেন। এদেশে ওদেশে ঝড় তুফান বন্যার পৌনপুনিক আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের অবস্থা ও ব্যবস্থার উপলব্ধিতে এই রচনাটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। □

লতিকা গুহ

উৎস মানুষের 'আড্ডা'

দোসরা এপ্রিল '89 উৎস মানুষ যে আড্ডার আয়োজন করেছিল তার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'অধার্মিকের জীবনযাত্রা' সম্পর্কে। সকাল 10টা থেকে আড্ডা শুরু হয়, প্রথম থেকে শ দুয়েক লোক আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন। দুপুরের দিকে তিনশো ছাড়িয়ে যায়। 39টা সংগঠন থেকে 116 জন মানুষ এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় 100 জন ব্যক্তি আড্ডায় অংশ গ্রহণ করেন। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24-পরগণা, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বীরভুম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আড্ডা দিতে গুরুদাস কলেজে মিলিত হন সকলে।

আড্ডার অপরিহার্য অঙ্গ চা-এর সাথে 'টা' দিয়ে শুরু হয় চেনা পরিচয়ের পালা। আড্ডার মূল বিষয়বস্তুর উপর ডাঃ সুজিত দাস আলোকপাত করেন। তিনি, বলেন অধার্মিক কথাটি এখানে সেকুলার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেকুলার মানে ধর্ম-নিস্পৃহ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়। এটা একটা দর্শন বা ভাবনা। তিনি জোর দেন সামাজিক জীবনযাত্রায় ধর্মের প্রভাবের উপর। সুজিত দাস বলেন, এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি। সুজিত দাস তাঁর বক্তব্যে শোষণহীন সুস্থ স্বাধীন সমাজ গড়ার প্রধান বাধা হিসাবে ধর্মকে চিহ্নিত করেন। ধর্ম ইহলোকের কথা না ভেবে পরলোকের কথা ভাবতে শেখায়। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরে সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় বলেন, অধার্মিক মানেই সেকুলার নয়। উৎস মানুষ বলতে চেয়েছে ধর্মীয় অনাচার বা কুসংস্কার না মানা। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী চিন্তাবিদেরা অধার্মিক ছিলেন না কিন্তু তাঁরা অনেকেই ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আবার উল্টোদিকে উদাহরণ হিসাবে বলেন, মার্টিন লুথার ধর্মের বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলন বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। কিন্তু আমরা যারা সাম্যবাদী সমাজ গড়তে চাই তাদের ধর্মের এই কুসংস্কার ও অনাচারের বিরোধিতা করতে হবে।

শাশ্বতী ঘোষের মতে সেকুলার সমাজ গঠনের জন্য সচেতনভাবে লড়াই করা দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

অজিতনারায়ণ বসু বলেন, অধার্মিক বা সেকুলার শব্দ থেকে তাঁর কাছে 'যুক্তিবাদ' কথাটিই বেশী পছন্দের। তিনি বলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তবে, কুসংস্কার বলতে আমরা যেন শুধু বাটি চালা, হাত চালা, মাদুলি, তাবিজ না বুঝি। এই ভাবেই আড্ডার স্বাভাবিক গতিতে আলোচনাটা ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায়। নাজেস আফরোজ চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন সেই দিনের কথা ভেবে, যেদিন ধার্মিকেরা গুণতিতে অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় পরিণত হবেন : সেদিন কি তাঁদের এই নির্যাতনের মুখে পড়তে হবে এখন যেমন অধার্মিকদের পড়তে হচ্ছে।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর আলোচনাটা এমন এক জায়গায় পৌছে গিয়েছিল যেখান থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। উৎস মানুষের আড্ডায় যে আলোচনা সবচেয়ে প্রয়োজন মনে হয়েছে তা হল বিভিন্ন সংগঠনগুলির সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধাগুলি কি কি ছিল এবং কিভাবে তারা সেগুলিকে কাটিয়ে উঠেছেন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করবার প্রতিশ্রুতি। আড্ডার ফলে আমরা জানতে পারলাম পশ্চিমবঙ্গের বুকে এমন অনেক সংগঠন আছে যারা একই আন্দোলনের অংশীদার। আড্ডাবাজদের আলোচনা থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায়, শুধু ভেল্কি ভেঙেই কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়া যাবেনা, তার জন্য চাই সমাজের সকল শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই, নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো তেরীর লড়াই। আড্ডার শেষে বাদল সরকারের পরমাণু শক্তি বিরোধী নাটক 'ভোমা' অনুষ্ঠিত হয়। □

নিলয় রায়

'গণদর্পণ' সমাচার

'গণদর্পণ' সংস্থা জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার যুব সদস্যদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রবন্ধের বিষয় :—"উনিশ শতকের ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন"। নাম দেওয়ার শেষ তারিখ 30 শে জুন, 1989।

গণদর্পণ 1988-র 5ই নভেম্বর কলকাতার কেনেডি হলে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করেছিলেন। আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাসপাতালগুলিতে দান করা মরণোত্তর দেহের যথাযথ সদ্ব্যবহার করার জন্য কি ধরনের পরিকাঠামো তৈরী থাকা উচিৎ, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান। উল্লেখ্য, গণদর্পণ চায়—চিকিৎসা শাস্ত্রের উত্তরোত্তর বিকাশের স্বার্থে, পরবর্তী প্রজন্মের নীরোগ জীবন সম্ভব করে তোলার জন্য, প্রতিটি মানুষ নিজের মরণোত্তর দেহ যাতে সমাজকে দান করে যান তার জন্য সকলকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে তুলতে কারণ "সেদিন সেই সদ্য নিস্প্রাণ দেহেরও চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, ত্বক, অস্থি, রক্ত মজ্জা, জীবিত মানুষের বহু রোগের নিরাময় এনে দিতে পারে।"

"গণদর্পণ দেশের মানুষকে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, অসামাজিক চিন্তা আর আচরণ নিয়েও ভাবিয়ে তুলতে চায়"।

গণদর্পণ প্রতিমাসে একটি পত্রিকা বার করে। নাম মুখপত্র গণদর্পন। গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। গণদর্পণের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা :—
গণদর্পণ, 32 ডি. ডি. এন. ঘোষ রোড, কলিকাতা—700025.

বিশেষ প্রতিবেদক

R. N. 34929/79
YEAR 12 NUMBER 5-6

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o A. Lahiri
B2, Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700074
March-June, 1989

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী : গত এক বছরে কি কি ছিল

মার্চ-এপ্রিল 1988

☐ ☐ সবুজ সম্ভাবনা (2) ॥ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর ☐ পদ্ধতির সন্ধানে বিজ্ঞান ॥ স্বরূপ গুপ্ত ☐ ভারতীয় প্রযুক্তি পরিস্থিতি : যুক্তি, তর্ক ও আশা নিরাশা ॥ সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ আর্সেনিকে আক্রান্ত অশোকনগর : একটি সমীক্ষা ॥ রাজশেখর রায়চৌধুরী ও অপূর্ব সাহা ☐ সার কারখানার বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলন : বর্তমান পরিস্থিতি ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ☐ পরিবেশ আন্দোলন এবং সঙ্কটগ্রস্ত এক ব্যক্তি ॥ র. চ. ☐ তারাপুর : কিছু বাস্তব সমস্যা ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ না, পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু চুল্লী চাই না ॥ মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠি, সঃ মঃ বি ও-বি ☐ অ্যামনিওসেন্টেসিস : একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ॥ দীপক ☐ গণবিজ্ঞান : লোকবিজ্ঞান ক্যালেণ্ডার ॥ রবীন মজুমদার ☐ বিজ্ঞান দিবস '88 ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ ☐

মে-জুন 1988

☐ ☐ মাসানোবু ফুকুওকা ॥ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ☐ সবুজ সম্ভাবনা (3) ॥ সুমিত বিশ্বাস, সুজয় মুখার্জী, সুরঞ্জন কর ☐ পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প : পরিচালন ব্যবস্থা ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ☐ **ক্রোড়পত্র—বিজ্ঞান শিক্ষা : প্রাথমিক হাল-চাল ॥ রবীন মজুমদার** ☐ ☐ বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয় ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ বালি-বাণ ॥ অঞ্জন চতুর্বেদী ☐ ☐

জুলাই-আগস্ট 1988

☐ ☐ বাড়াবাড়ি—দুনিয়া জুড়ে ॥ রবীন চক্রবর্তী ☐ জনবিজ্ঞান : একটি নতুন জীবনচর্চা ॥ প্রদীপ দত্ত ☐ কারিগরী শিক্ষা : দিশার সন্ধানে ॥ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ইন্দিরা সাগর প্রকল্প—বিশ্লেষণ ও বিরোধিতা ॥ CAISA ☐ 'উই লাভ ইউ ডিক' —প্রয়াত রিচার্ড ফাইনম্যানের প্রতি। সুব্রত ভট্টাচার্য ☐ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা জাগানোর প্রয়াস। চুঁচুড়ার বিজ্ঞান ক্লাবের বারো বছর ॥ ধ্রুবজ্যোতি দে ☐ সাপে কাটলে কি করবো : একটি বিতর্ক ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ ☐

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1988

☐ ☐ বি-ও-বি'র কথা—লঘু দ্রবণের জোরালো ক্ষমতা ☐ একটি বিতর্কিত (অ-) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ॥ গৌতম ব্যানার্জী ☐ প্রসঙ্গ হোমিওপ্যাথি : পত্রিকা পরিচিতি ॥ র.ম. ☐ হোমিওপ্যাথির পরীক্ষামূলক ভিত্তি : একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ সবুজ সম্ভাবনা (4) ॥ সুজয় মুখার্জী, সুমিত বিশ্বাস, সুরঞ্জন কর ☐ বুদ্ধিজীবীর দায়বদ্ধতা ॥ (অনুবাদ) সুভাষ গাঙ্গুলী ☐ বৌদ্ধিক কারখানা ক্রেসিডা : তালা এখনো খোলে নি ॥ বিশেষ প্রতিবেদক ☐ এবার বিকল্প নোবেল পুরস্কার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ॥ সৌমেন গুহ ☐ হোমিওপ্যাথি বিতর্ক : দ্বিতীয় পর্যায় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ চিঠিপত্র ☐ ☐

জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী 1989

☐ ☐ বি-ও-বি'র কথা—ভূপাল : এবার হোক মানবিক অধিকার ॥ সৌমেন গুহ ☐ রাজধানী 1988 : কলেরা মহামারী ॥ সুরঞ্জন কর ☐ কিসের আলয়—বিদ্যালয় ॥ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ টেলিভিশনে লোকবিজ্ঞান ॥ সন্ধানী ☐ সভ্য অন্ধবিশ্বাস : পরিচিতি ॥ সৌমেন গুহ ☐ হার্ট অ্যাটাকের সংকেত ॥ বিষ্ণুপদ জানা ☐ হার্ট অ্যাটাক মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয় ॥ সুদীপ্ত সরস্বতী ☐ পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন : কোথায় ও কেন ॥ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ গ্রীন হাউস এফেক্ট : সাম্প্রতিক উদ্বেগ ॥ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ চাকদহ : পেপার মিলের ছোবল ॥ শান্তনু ত্রিবেদী ☐ সমীক্ষা ॥ চাকদহ সাইন্স ফোরাম ☐ মাছের মড়ক : একটি প্রতিবেদন ॥ এম. মণ্ডল ও জয়দেব জানা ☐ বই পরিচিতি ॥ সুনীশ দেব ☐ জানবার কথা ॥ সুশ্রুত ☐ নর্মদা বাঁধ : মানবিক অধিকারের লড়াই ॥ র.ম. ☐ ☐

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং সেন্টার, 18 ভুবন ধর লেন, কলি-12 থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত